দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

সীমান্তে যেখানেই আঘাত আসবে কঠোর প্রত্যুত্তর দিতে হবে
— পৃঃ ১৪

বালুচিস্তান থেকে নজর ঘোরাতেই কুলভূষণ কাণ্ডের ছক পাকিস্তানের
— পৃঃ ১৬

৭০ বর্ষ, ২০ সংখ্যা।। ৮ জানুয়ারি ২০১৮।। ২৩ পৌষ - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে পড়ুয়ারা কতটা নিরাপদ?

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ২০ সংখ্যা, ২৩ পৌষ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

৮ জানুয়ারি - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ / ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

ইংরেজি নতুন বছরের সেরা উপহার মোদী সরকারের তিন তালাক ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : 'মাতৃ'হারা ভারতী, রাজনীতিতে কোনো 'মমতা' নেই ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

তথাকথিত বিজ্ঞজনদের ধর্মগত বিদ্বেষ তাঁদের চিন্তাকে বিষাক্ত করে তুলেছে ▯ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১২

সীমান্তে যেখানেই আঘাত আসবে কঠোর প্রত্যুত্তর দিতে হবে ▯ মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অঃপ্রা) ▯ ১৪

বালুচিস্তান থেকে নজর ঘোরাতেই কুলভূষণ কাণ্ডের ছক পাকিস্তানের ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ১৬

বাংলা অভিধানে নতুন শব্দবন্ধ 'দুষ্টু স্যার' ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ১৯

কাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা ▯ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস ▯ ২০

জি ডি বিড়লা কাণ্ড - কার নিন্দা করো তুমি ভাই? ▯ ড. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় ▯ ২২

নির্বাচন জেতা একটি শিল্পকর্মের মর্যাদা দাবি করে ▯ রাম মাধব ▯ ২৭

ডাকটিকিটে স্বামী বিবেকানন্দ ▯ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ৩১

বিস্মৃতির অতলে স্বামীজীর সাধনা ▯ ড. রাকেশ দাস ▯ ৩২

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে খরিফ ভুট্টার চাষ ▯ ড. মানবেন্দ্র রায় ও অঙ্কিতা বেগম ▯ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

এইসময়, সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ ▯ চিঠিপত্র : ২৯-৩০ ▯ অঙ্গনা : ৩৪ ▯ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৬ ▯ সুস্বাস্থ্য : ৩৭ ▯ অন্যরকম : ৩৮ ▯ খেলা : ৩৯ ▯ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ফিরে দেখা : ১০১৭

একটা বছর যখন শেষ হয় তখন পাওয়া এবং না-পাওয়ার ব্যালান্সশিটটি মিলিয়ে দেখতে সকলেই ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। ২০১৭ আমাদের জিএসটি দিয়েছে। তিন তালাক বিল দিয়েছে। এমন অনেক ঘটনার সাক্ষী বছরটি, যা বর্তমান সময়ের বিশেষত্বগুলিকে ফুটিয়ে তোলে। আবার অনাগত সময়ের পূর্বাভাসও দেয়। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় বিশিষ্ট লেখকরা ২০১৭-র অনুপুঙ্ক্ষ বিশ্লেষণ করবেন। তাদের আলোচনায় উঠে আসবে অনেক অজানা তথ্য।

।। দাম একই থাকছে : দশ টাকা।।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মমতার ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ

সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ৭৮ তম অধিবেশনের মঞ্চ হইতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে ইতিহাস বিকৃত করিবার অভিযোগ আনিয়াছেন। রাজনৈতিক স্বার্থের জন্যই এই ইতিহাস বিকৃত করা হইতেছে বলিয়া তাঁহার অভিযোগ। মহাত্মা গান্ধীকে দেশভক্ত হিসাবে স্বীকার না করিয়া তাঁহার হত্যাকারী নাথুরাম গডসেকে রাষ্ট্রভক্ত হিসাবে মোদী সরকার নাকি প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের মঞ্চ হইতে এই অভিযোগ করিয়াছেন, তাই বিষয়টিকে লঘু করিয়া দেখা ঠিক হইবে না। ওই মঞ্চে রোমিলা থাপার, ইরফান হবিব প্রমুখ ইতিহাসকাররা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারাও মোদী সরকারের বিরুদ্ধে ইতিহাস পুনর্লিখন করিবার অভিযোগ আনিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্যে প্রভাবিত হইয়াই যে মমতার এই অভিযোগে তাহা স্পষ্ট। থাপার, হবিব প্রমুখ বামপন্থী বিচারে বিশ্বাসী। সকল বিষয়েই বামপন্থীদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রহিয়াছে। অর্থনীতি ও ইতিহাস সংক্রান্ত বিষয়েও তাঁহাদের নিজস্ব বক্তব্য বিদ্যমান।

ভারতের ইতিহাস মধ্য যুগে মুসলমান লেখক এবং ইংরেজ আমলে ব্রিটিশ লেখকগণ নিজেদের মতো করিয়া লিখিয়াছেন। কংগ্রেস শাসনাধীন ভারত বামপন্থী মতাদর্শীদের এই সুযোগ করিয়া দিয়াছে। বামপন্থীরা ইতিহাস লিখিয়াছেন ভারতীয় তথা হিন্দুদের ছোট করিয়া দেখাইবার উদ্দেশ্যে। গুণমানে উচ্চ ভারতের স্থাপত্য শিল্প-সহ যাহা কিছু হইয়াছে তাহা সবই নাকি মোগল বাদশা ও ব্রিটিশদের সৃষ্টি। ইহার পূর্বে ভারতীয়রা কিছুই করেন নাই। ভারতের জাতীয় ভাবকে সংখ্যাগরিষ্ঠের জাতীয়তাবাদ বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টাও বামপন্থীরা চালাইয়া যাইতেছেন। পাঠ্যপুস্তকে শিশুদের ভুল ইতিহাস শিক্ষা দিয়া মগজ ধোলাইয়ের ব্যবস্থা অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে করা হইয়াছে। মুসলমান ও ব্রিটিশ লেখকদের লেখা পড়িয়া তথাকথিত পাশ্চাত্য ভাবনায় ভাবিত বর্তমানকালের ইতিহাসকাররা সেই ভাবেই ইতিহাস লিখিতেছেন। বামপন্থীরা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রয়োজন অনুসারে ইতিহাসের ব্যাখ্যা করিতেছেন। সঙ্গত কারণেই সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য ইতিহাসের পুনর্লিখন জরুরি হইয়া পড়িয়াছে। ব্যক্তি ও সমাজ ভাবনার ক্ষেত্রেও তাহা প্রযোজ্য।

মমতা ব্যানার্জী ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগের পাশাপাশি এই কথাও বলিয়াছেন, বাংলাকে বাদ দিয়া ইতিহাস লিখিলে তাহা অসম্পূর্ণ হইবে। কথাটি ঠিকই এবং এই কারণেই বামপন্থীদের শাসনে পশ্চিমবঙ্গ আর্থিক দিক থেকে কীভাবে পিছাইয়া পড়িয়াছে, তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে। বামপন্থীদের মতাদর্শের কারণেই যে পশ্চিমবঙ্গ আর্থিক দিকে পিছাইয়া পড়িয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? শুধু আর্থিক কেন, শিক্ষাক্ষেত্রও ইহার ব্যতিক্রম নহে। বামপন্থী ইতিহাসকারদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া মমতা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যে ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ তুলিয়াছেন, তাহা প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়।

মমতা নিজেও জানেন বামপন্থী শাসনে পশ্চিমবঙ্গ আর্থিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে কীভাবে পিছাইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষা ও ইতিহাসের গৈরিকীকরণের অভিযোগও বামপন্থী মতাদর্শ অনুসারে পরিচালিত। মমতা এখন বামপন্থীদের এই মিথ্যা অভিযোগকেই স্বীকৃতি দিতেছেন। তৃণমূলের শাসনেও শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ চলিতেছে। শিশুদের পাঠক্রমেও পর্যন্ত এই হস্তক্ষেপ। বিশেষত ইতিহাসের পাঠক্রমে, যেমন সিঙ্গুরের আন্দোলন যুক্ত হইয়াছে। ইতিহাস বিকৃতি নয়, ইতিহাস পুনর্লিখন তাই প্রয়োজন।

সুভাষিতম্

ভৃত্যা বহুবিধাঃ জ্ঞেয়াঃ উত্তমাধমমধ্যমাঃ।

তে নিয়োজ্যা যথাযোগ্যং ত্রিবিধেষু চ কর্ম্মসু।। (চাণক্যনীতি)

উত্তম, অধম ও মধ্যম—ভৃত্য এই প্রকারের হয়ে থাকে। যোগ্যতানুযায়ী এই তিন প্রকার ভৃত্যকে উপযুক্ত কাজে নিয়োগ করা উচিত।

চীনের দখল করা বাজারে নিষ্প্রভ ভারতীয় পণ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি।। নেপাল থেকে প্রতিদিনই চোরাপথে চীনা পণ্য ঢুকছে শিলিগুড়িতে। অভিযোগ উঠেছে, বিনা শুল্কের পণ্যের দাপটে মার খাচ্ছে অপেক্ষাকৃত বেশি মূল্যের ভারতীয় পণ্য। রেলপথে এই পণ্য ঢুকছে শিলিগুড়িতে। এই পণ্য আনতে ব্যবহার করা হচ্ছে নকশালবাড়ি-শিলিগুড়ি জংশন রুটের ট্রেনগুলিকে। 'ক্যারিয়ার' বা বাহক দিয়ে এই চীনা পণ্য শহরে ঢুকছে। আর এই পণ্য আমদানিতে পুলিশের একাংশ পাচারকারীদের প্রত্যক্ষ মদত দিচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে ব্যবসায়ীদের তরফে। পুলিশের পক্ষ থেকে পাচারের সমস্যার কথা স্বীকারও করা হয়েছে। তবে নজরদারির অভাবের বিষয়টি পুলিশ স্বীকার করতে চায়নি। শিলিগুড়ির রেল পুলিশের সুপার উজ্জ্বল ভৌমিক বলেন, 'সব সময় আমাদের নজরদারি চলে। মাঝে মধ্যেই অভিযান চালিয়ে প্রচুর পণ্য উদ্ধার করা হয়। তবে কর্মীর অভাব থাকায় মাঝে মধ্যে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়।'

তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনও বাহকই গ্রেপ্তার হন না বলে অভিযোগ। ব্যবসায়ীরা মনে করছেন, পুলিশ ইচ্ছে করেই এদের গ্রেপ্তার করে না। বিধান মার্কেটের এক ব্যবসায়ী বলেন, 'অনেকে চীনা পণ্যই বেশি বিক্রি করেন। কারণ এর কোনও বিক্রয়মূল্য থাকে না। লাভও আকাশছোঁয়া।' অন্য এক ব্যবসায়ী বলেন, 'এইসব মালের প্রতিই আমাদের আগ্রহ বেশি। কারণ পুরোটাই চোরাই। কিনতে হয় অর্ধেকের কম দামে। দেখতেও হুবহু নামি ব্র্যান্ডের মতই। ফলে মানুষের মধ্যে চাহিদাও বেশি।' এক ব্যবসায়ী স্বীকারও করে নিলেন, 'নানা জায়গায় ভাগ দিয়েও যা থাকে তাতেও ভালই লাভ হয়।'

পুলিশেরই একটি সূত্রের খবর, এই সব পণ্য নেপাল থেকে এনে প্রতিদিন নকশালবাড়ি থানায় হাজিরা দিয়ে স্টেশনে জমা করা হয়। এরপর ট্রেনে তুলে দেওয়া হয় শিলিগুড়ির উদ্দেশে। নকশালবাড়ি স্টেশনে দিনে মোট পাঁচটি ট্রেন দাঁড়ায়। আলুয়াবাড়ি-নিউ জলপাইগুড়ি, কাটিহার-শিলিগুড়ি জংশন, রাধিকাপুর-নিউ জলপাইগুড়ি, বালুরঘাট-নিউ জলপাইগুড়ি, কাটিহার-শিলিগুড়ি প্যাসেঞ্জার। এই ট্রেনগুলি নকশালবাড়ি স্টেশনে এলেই পুলিশের মদতেই প্রতিটি কামরায় বোঝাই হয়ে যায় পেল্লাই সাইজের বস্তা ও কাপড়ের পুঁটুলি। কখনও যাত্রীরা আপত্তি করলে, ওইসব চোরাই মাল লোহার শিক বাঁকিয়ে তৈরি হুক দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় জানালার গায়ে। বাহকের কাজে মহিলারাই বেশি যুক্ত। এ বিষয়ে দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার অখিলেশ চতুর্বেদী বলেন, 'আমার এই বিষয়টি জানা নেই। বিশদে খোঁজ নিয়ে দেখব।' নিউ জলপাইগুড়ি যাত্রী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দীপক মহান্তি অভিযোগ করেন, 'এইসব পণ্য আমদানি করতে গিয়ে প্রতিদিন পুলিশের সঙ্গে দর কষাকষি চলে বাহকদের। দরে না পোষালে মহিলা বাহকদের মারধরও করেন তাঁরা।' এক বাহক নিজেই জানালেন, 'এর আয় থেকে লাভের ভাগ পান বিভিন্ন থানার অফিসাররাও। তাঁদের সঙ্গে দরে না পোষালে পণ্য লুঠ করে নেন তাঁরা। ফলে পুলিশকে সমঝে চলতে হয়।' শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার জগমোহন পাচারের বিষয়ে জানেন না বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি গোটা ব্যাপারটি খতিয়ে দেখব।' শুধু শিলিগুড়িই নয়, জংশন থেকে বাসে করে পণ্য চলে যায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায়। উত্তরবঙ্গের বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, জয়গাঁ, বীরপাড়া, ধূপগুড়িতে চীনা পণ্যের চাহিদা রয়েছে।

ডোকলাম অতীত, চীন এখন ভারতের বন্ধুত্ব চায়

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ডোকলামে ভারত এবং চীনের সৈন্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা এবং তাই নিয়ে ৭২ দিন ধরে সারা দেশজুড়ে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা এখন অতীত। চীন যে এখন আর ভারতের সঙ্গে কোনওরকম রেষারেষির পক্ষপাতী নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেল সম্প্রতি। চীনের বিশেষ প্রতিনিধি ইয়াং জিয়েচি ভারতে এসেছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হবেন বলে। তাঁদের আলাপচারিতাতেই উঠে এসেছে চীনের সাম্প্রতিক মনোভাব সম্পর্কিত কিছু তথ্য। উল্লেখ্য, গত অক্টোবরেই ইয়াং জিয়েচি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ২৫ সদস্য বিশিষ্ট পলিটব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ভারত ও চীনের মধ্যে অনুষ্ঠিত ২০তম সীমান্ত বৈঠকে তিনি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ডোকলাম-পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁর এই ভারত সফর নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। সূত্রের খবর, ইয়াং জিয়েচি চীনা প্রেসিডেন্ট জিন জিনপিংয়ের দূত হয়ে এবার ভারতে এসেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করে তিনি চীনের বর্তমান মনোভাবের কথা ব্যক্ত করেন।

চীন সীমান্তে রাস্তা তৈরি করবে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ উত্তরকাশী জেলার নেলং উপত্যকায় ইন্দো-টিবেটিয়ান সীমান্ত পুলিশের জওয়ানদের সঙ্গে ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনটি কাটালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। ইন্দো-টিবেট বর্ডার পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল আর. কে. পচনন্দাকে সঙ্গে নিয়ে রাজনাথ সিংহ জওয়ানদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং সীমান্তে আকস্মিক হামলার প্রতিরোধে সেনা কতটা প্রস্তুত তা পরিদর্শন করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, সরকার শীঘ্রই ভারত-চীন সীমান্তের পোস্টগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত করার জন্য রাস্তা তৈরি করবে। তিনি বলেন, 'এই উদ্যোগ কার্যকরী হলে আধিকারিকদের দক্ষতা আরও বাড়বে এবং পার্বত্য অঞ্চলে থাকার জন্য যেসব অসুখবিসুখ হয় তার চিকিৎসারও সুরাহা হবে।' সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১১,৬৩৬ ফুট উচ্চতায় জওয়ানরা যেভাবে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন তার জন্য তিনি তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। জওয়ানদের 'হিমবীর' আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, 'হিমালয়ের সীমান্তে হিমবীরেরা ন্যায়-নীতি এবং আদর্শের জন্য লড়াই করছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সবসময়েই তাদের পাশে আছে। আরও কীভাবে সাহায্য করা যায় ভেবে দেখছে সরকার।'

লোকসভায় 'প্রধানমন্ত্রী বয়ঃ বন্দনা যোজনা'র তথ্য পেশ প্রতিমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বার্ধক্যে সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং সুদের হ্রাস পাওয়ার ফলে যাটোর্ধ্ব প্রবীণ নাগরিকরা যাতে অনিশ্চয়তার মধ্যে না পড়েন তা সুরক্ষিত রাখতে 'প্রধানমন্ত্রী বয়ঃ বন্দনা যোজনা'র সূচনা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় ও উপার্জনের সুরক্ষা লাভ করবেন প্রবীণ নাগরিকরা। কর্মসূচিটি রূপায়িত হচ্ছে ভারতীয় জীবন বিমা নিগম (এলআইসি)-এর মাধ্যমে।

'প্রধানমন্ত্রী বয়ঃ বন্দনা যোজনা'য় ৮ শতাংশ হারে ১০ বছর ধরে নিশ্চিত আয়ের সুযোগ পাওয়া যাবে। মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক অথবা বার্ষিক পেনশন হিসেবে এই আয় জমা পড়বে সংশ্লিষ্ট পলিসি গ্রহীতার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। প্রকল্পে বিনিয়োগের ন্যূনতম পরিমাণ ১.৫ লক্ষ টাকা। তা থেকে প্রতি মাসে ন্যূনতম ১ হাজার টাকা করে পেনশন পাওয়া যাবে ১০ বছর ধরে। প্রকল্পটিতে সর্বোচ্চ বিনিয়োগের পরিমাণ ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এর মাধ্যমে প্রতি মাসে পেনশন জমা পড়বে সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা। বয়ঃ বন্দনা যোজনা সম্পূর্ণভাবে পণ্য ও পরিষেবা করমুক্ত একটি কর্মসূচি। এটি খোলা থাকবে ৩ মে, ২০১৮ পর্যন্ত।

সম্প্রতি লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী শিবপ্রতাপ শুক্লা।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শিবিরের কাছ থেকে গ্রেপ্তার জঙ্গি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০১৭-র শেষের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে রোহিঙ্গা মুসলমানের সংখ্যা ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার। এর মধ্যে গত বছর আগস্ট থেকে বছরের শেষ অবধি মায়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গার সংখ্যা সাড়ে তিন লক্ষেরও বেশি। এই রোহিঙ্গাদের আড়ালে মৌলবাদী উগ্রপন্থীরা ঘাঁটি গেড়েছে বলে ভারত-বাংলাদেশ দু'দেশেরই গোয়েন্দাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এই প্রমাণকে আরও জোরদার করল গত ৩১ ডিসেম্বরের একটি ঘটনা। ওইদিন বাংলাদেশের পুলিশ উখিয়ার সীমান্ত অঞ্চল থেকে গ্রেপ্তার করে সন্দেহভাজন ইসলামিক জঙ্গি শারফুল অওয়ালকে। শারফুলের বয়স ৩০ বছর। আন্তর্জাতিক জেহাদি গোষ্ঠীর সঙ্গে তার নিয়মিত যোগাযোগের কথা র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (আর এ বি বা র‍্যাব)-এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, মুসলমান অধ্যুষিত দেশগুলিতে ইসলামি জঙ্গিবাদকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য র‍্যাব গঠিত হয়েছে। শারফুলকে ধরার ক্ষেত্রে এরাই প্রধান ভূমিকা নিয়েছে।

র‍্যাবের স্থানীয় প্রধান রাহুল আমিন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, গত বছরের জানুয়ারিতে শারফুল জেল থেকে জামিনে ছাড়া পায়। বাংলাদেশের চট্টগ্রামে জঙ্গি কার্যকলাপ ও বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িত ছিল সে। আমিন তাঁর বিবৃতিতে এও জানিয়েছেন যে জেল থেকে বেরোনোর পরই শারফুল সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকে। তার লক্ষ্য ছিল জেহাদের মাধ্যমে জঙ্গিদের মুক্তাঞ্চল খিলাফত গঠনের। গোয়েন্দারা নিশ্চিত যে জামায়েত উল মুজাহিদিনের নয়া জঙ্গিগোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য সে।

এই গ্রেপ্তারির ঘটনায় রোহিঙ্গা শিবিরগুলি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পক্ষে কতটা নিরাপদ সে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। কারণ জঙ্গিরা এই শিবিরগুলি 'সফট টার্গেট' করেছে। ফলে এই অঞ্চলের নিরাপত্তা কর্মীদের কপালে নতুন বছরে জোরালো ভাঁজ ফেলেছে উদ্বাস্তু রোহিঙ্গা শিবিরগুলি।

২-জি মামলার রায়ের নজর সত্যের বদলে ছিল দোষ ত্রুটি ধরার দিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ যে সমস্ত উকিলবাবু দেশের নানা প্রান্তের আদালতে ব্যবহারজীবী হিসেবে কাজ করছেন তাদের কাছে সি বি আই এর তরফে ২-জি মামলায় দাখিল করা দীর্ঘ চার্জশিটের ভিত্তিতে আরও দীর্ঘতর যে ২১৮৩ পাতার রায় সংশ্লিষ্ট ট্রায়াল কোর্টের বিচারক দিয়েছেন সেটি একটি অবশ্যপাঠ্য বিষয় হওয়া উচিত। এর অন্যতম কারণ এই রায় থেকে হবু বিচারকরা একটা জিনিস শিখতে পারবেন, রায়দানের ক্ষেত্রে কীভাবে অকাট্য প্রমাণকে অবহেলা করতে হয়।

একজন ট্রায়াল কোর্টের বিচারকের অতি অবশ্য কর্তব্য হলো অভিযুক্তকে যথোপযুক্ত বিচার পাওয়ার সুযোগ দেওয়া। একই সঙ্গে এই উদ্দেশ্য সাধন করার ক্ষেত্রে তাঁকে অপরপক্ষের দাখিল করা তথ্যগুলির প্রামাণ্যতাকে সবিশেষ গুরুত্বে বিচার করতে হয় যাতে সত্যে উপনীত হওয়া যায়। একজন অভিজ্ঞ বিচারক অবশ্যই জানেন যে দীর্ঘ সময় পার হয়ে যাওয়ার পর কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রমাণ জোগাড় করা কতটাই কষ্টাসাধ্য ব্যাপার। বিশেষ করে যদি এই ধরনের অপরাধ আবার প্রভাবশালী বা ক্ষমতাধারী কোনো মন্ত্রী পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তাঁকে চাল থেকে খুদ বেছে আলাদা করা কাজটা জেনেই সত্যে পৌঁছতে হবে।

প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ও রায়ের প্রতিলিপি মোতাবেক দেখা যাচ্ছে বিচারক বিশাল খুদের পাহাড় থেকে শস্য বেছে নিতে মনঃসংযোগ হারিয়ে ফেলে সব অভিযুক্তকেই বেকসুর খালাস দিয়ে দিয়েছেন। এই মামলার শুরুতেই মাথায় রাখতে হবে যে অপরাধের ক্ষেত্রে কতটাকা জড়িয়ে ছিল যেটি পূর্বোল্লেখিত শস্য নয়। মামলাটি ছিল Prevention of Corruption Act-এর অধীনে। সে আইনে যদি কোনো সরকারি কর্মী বা জনপ্রতিনিধি কোনো ঘুষ বা অন্য কোনো উপঢৌকন না নিয়েও কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে কোনো বরাত পাইয়ে দেন এটা জেনে যে তাঁর কাজের ফলে সরকারি কোষাগারের ক্ষতি সাধিত হবে তাহলেই তাঁর এই অনৈতিক কাজ PC Act-এর আওতায় পড়ে যাবে।

রায়টি অনাবশ্যক, অনভিপ্রেত, অপ্রাসঙ্গিক নানা অভিমতে ভরা। উদাহরণস্বরূপ, সাক্ষী অসিরভাথম আচার্যের তাঁর উপরওয়ালা- সচিবের ওপর তৎকালীন টেলিকম মন্ত্রীর ধমক দেওয়ার বিষয়টির উল্লেখ। বিচারক বলছেন বেচারা মন্ত্রী কী করবেন এরকম একজন একগুঁয়ে, কাজ পিছিয়ে দেওয়ার মানসিকতা সম্পন্ন মন্ত্রীকে সামলাতে তাঁকে তো চেঁচাতেই হবে। এখানেই শেষ নয়, জজ লিখছেন একজন সচিবকে মনে রাখতে হবে একজন মন্ত্রী জনতার ভোটে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন এবং সাংবিধানিক অধিকার বলে তিনিই সরকারি দপ্তরের সর্বময় কর্তা। একজন মন্ত্রী রন্ধ্রে রন্ধ্রে একজন রাজনীতিবিদ। তিনি তাঁর নির্বাচকমণ্ডলী ও সংসদের কাছে দায়বদ্ধ। একই সঙ্গে মন্ত্রীসভায় টিকে থাকতে গেলে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীরও বিশ্বাসভাজন হতে হয়। রায় পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয় বিচারক কি মন্ত্রীদের নির্বাচক মণ্ডলীর প্রতি দায়বদ্ধতা ও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা সূত্রে তাঁর অফিসারের ওপর ধমক লাগানো ন্যায়সঙ্গত কিনা এমন কিছু বিচার করছিলেন? বিচারক আদ্যপ্রান্ত সিবিআই তদন্তের মধ্যে ভুল খোঁজার কাজে ব্যস্ত থেকে সাক্ষীদের পরীক্ষা করার প্রয়োজন মনে করেননি। সি বি আই আইনজীবীদের নিন্দা করতে গিয়ে সিআরপিসি ৩১১ ধারা অনুযায়ী অপরাধের নিষ্পত্তিতে নিজ সন্তুষ্টি অনুযায়ী তিনি যে যে-কোনো সাক্ষীকে এজলাসে ডাকার অধিকারী সে ক্ষমতা সম্পূর্ণ ভুলে যান বলে মনে হয়। এই ধারার অধীনে তিনি যদি মনে করেন কোনো সাক্ষীর সঠিক জেরা হয়নি, সত্য উদ্‌ঘাটনে তার পুনর্সাক্ষ্য প্রয়োজন তাকে তিনি যতবার প্রয়োজন ডাকতে পারেন। কিন্তু কেন তিনি re-examination থেকে বিরত থাকলেন। উল্টে তিনি নিজেই স্বীকার করে নিলেন যে দিনের পর দিন সিবিআই তাঁর আদালতে প্রমাণ নিয়ে আসবে বলে তিনি অপেক্ষারত ছিলেন।

সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে বিচারক নৃপেন মিশ্র, ডিএস মাথুর, এ রাজা, পুলক চ্যাটার্জী, টি কে নায়ার প্রমুখের সম্পর্কে অভিমত তৈরির চেষ্টা করেন। তিনি কি তাহলে এনাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ করে দিলেন? সেক্ষেত্রে প্রদত্ত দস্তাবেজের ভিত্তিতে তিনি তাঁদের আচরণ সম্পর্কে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে যদি পৌঁছতে পেরে থাকেন তাহলে অভিযুক্তদের ক্ষেত্রে সেই একই দলিল থেকে তিনি তা পারলেন না কেন?

দলবীর সিংহ ও হরিয়ানা সরকারের মামলায় ২০০৮ সালের ১৫ মে সর্বোচ্চ আদালত জানায় "Even if major portion of evidence is found to be deficient, residue is sufficient to prove guilt of an accused." আদালত এই সূত্রে আরও বলেছিল একটা বিরাট সংখ্যক সম-অভিযুক্ত ছাড়া পেয়ে গেলেও এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট অভিযুক্তের সাজা কিন্তু হতেই হবে। যে কাজে সফল হতে গেলে আদালতে প্রদত্ত প্রমাণগুলিকে যাচাই করা জরুরি। এক্ষেত্রে বিচারককেই খুদের পাহাড় থেকে চাল আলাদা করতে হবে। বিচারকের পূর্ণ অধিকার থাকবে কোনো অপরাধীকে সনাক্ত করে তাকে সাজা দেওয়ার, যতই না একই অপরাধের সহ-অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে যায় যেহেতু তাদের ক্ষেত্রে হয়তো পর্যাপ্ত প্রমাণ ছিল না।

অন্যের মতের প্রতি সম্মান জানাতে সংসদ চালু রাখতেই হবে : বেঙ্কাইয়া নাইডু

নিজস্ব সংবাদদাতা।। সংসদ হলো ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল স্নায়ুকেন্দ্র। আর তাই একে চালু থাকতেই হবে, বলেছেন ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু। গত ৩০ ডিসেম্বর কলকাতায় দেশের প্রাচীনতম বণিকসভা ক্যালকাটা চেম্বার অব কর্মাসের ১৮৭তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত 'সংসদীয় গণতন্ত্রকে পুনরায় উজ্জীবিত করা' শীর্ষক আলোচনাচক্রে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি একথা বলেন। শ্রী নাইডু বলেন, ইদানীং সংসদের কাজকর্মের বিষয়ে চারিদিকে প্রভূত সমালোচনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কেননা, মানুষ আর সেখানে সময়ের অপব্যয় পছন্দ করছেন না। এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রী নাইডু বলেন, আমাদের তিনটি 'ডি' রয়েছে— 'ডিসকাস', 'ডিবেট' ও 'ডিসাইড', কিন্তু কখনই ডিজরাপ্ট বা অচল করে দেওয়া নয়। গণতন্ত্রের অর্থ অন্যের মতামতকে সম্মান জানানো। বিভিন্ন মতামতকে সঙ্গে নিয়ে চলাই হলো গণতন্ত্রের সবথেকে সুন্দর পন্থা।

আমাদের গৌরবময় অতীতের উল্লেখ করে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, এমন এক সময় ছিল যখন বহিঃশত্রুরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেনি, আর সেই সময় বিশ্বের মোট উৎপাদনের ২৭ শতাংশই ছিল এ দেশের। বর্তমান সরকারের আমলে দেশের গৌরব বৃদ্ধি ঘটছে বলে জানিয়ে তিনি বলেন যে নানা সংস্কার গৃহীত হওয়ার ফলে বর্তমান সময়ে ভারত বিদেশি বিনিয়োগের অন্যতম সেরা আকর্ষণ স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি আরও জানান, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এযাবৎ ৪৩.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সর্বাধিক বিদেশি বিনিয়োগ নথিভুক্ত হয়েছে ২০১৬-১৭-তে।

আলোচনাচক্রে ভাষণ প্রসঙ্গে উপরাষ্ট্রপতি দেশের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সঞ্চারে সংবাদমাধ্যমকে উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণেরও আহ্বান জানান। রামনাথ পোয়েঙ্কা, সি আর ইরানি, নিখিল চক্রবর্তী প্রমুখের অসামান্য কৃতিত্বের উল্লেখ করে তিনি সংসদবিদদের ইতিবাচক ও গঠনমূলক ভূমিকাকে তুলে ধরতে সংবাদমাধ্যমকে অনুরোধ করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রী নাইডু বলেন, স্বাধীনতার ৬৯ বছর পর এখন সময় হয়েছে আন্তরিক ও গুরুতর মূল্যায়নের। আর এটা শুধু যে রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয়, সংশ্লিষ্ট সবার জন্যই এটির প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী, রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, বণিকসভার সভাপতি রাজেশ খান্ডেলওয়াল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উবাচ

"লোকসভায় তিন তালাকের বিরুদ্ধে বিল পাশ হওয়ায় আনন্দে মেতে ওঠা মহিলাদের এখন বোরখা খুলে ফেলে দিতে হবে। কেননা বোরখা তিন তালাকের চেয়েও বেশি ঘাতক।"

তসলিমা নাসরিন
বাংলাদেশি লেখিকা

লোকসভায় তিন তালাক বিল পাশ প্রসঙ্গে

"সন্ত্রাসের আবহে ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট কিছুতেই সম্ভব নয়। দু'দেশের মাটিতে নয়, এমনকী তৃতীয় কোনো নিরপেক্ষ দেশেও নয়।"

সুষমা স্বরাজ
ভারতের বিদেশ মন্ত্রী

সীমান্তে পাকিস্তানের যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন প্রসঙ্গে

"পাকিস্তান আর কোনো মার্কিন সাহায্য পাবে না। কারণ সন্ত্রাসবাদীদের তারা নিরাপদ আশ্রয় দেয়।"

ডোনাল্ড ট্রাম্প
আমেরিকার রাষ্ট্রপতি

পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেওয়া প্রসঙ্গে এক ট্যুইট বার্তায়

"'পদ্মাবতী'র বিষয়টি পুরোপুরি বোর্ডের ব্যাপার। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে সেন্সর বোর্ডই।"

প্রসূন যোশী
সিবিএফসি-র চেয়ারম্যান

বিতর্কের অবসানে বিশেষ প্যানেলের পরামর্শ প্রসঙ্গে

"ভীরুর মতো হামলা চালিয়েছে জঙ্গিরা। সাহসী জওয়ানদের জন্য আমরা গর্বিত। তাদের বলিদান বিফলে যাবে না। সারাদেশ শহিদ পরিবারের পাশে রয়েছে।"

রাজনাথ সিংহ
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলা প্রসঙ্গে

ইংরেজি নতুন বছরের সেরা উপহার মোদী সরকারের তিন তালাক বিল

ইংরেজি ক্যালেন্ডারের পাতায় নতুন বছর শুরু হয়েছে। ফেলে আসা বছর ২০১৭ সালের শেষে সবচেয়ে যে বড় খবর আমাকে নাড়া দিয়েছে তা হচ্ছে লোকসভায় তিন তালাক বিল পাশ হওয়ার ঘটনা। পুরুষতান্ত্রিক মুসলমান সমাজে ধর্মের নামে মহিলাদের উপর যে নৃশংস অত্যাচার হাজার বছর ধরে চলে আসছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস এই প্রথম মোদী সরকার দেখিয়েছে। অতীতে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কোনো সরকার দেখায়নি। কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী তালাকপ্রাপ্তা শাহবানুর খোরপোশের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় বদল করে সংসদে বিল পাশ করিয়েছিলেন। সেই বিলে বলা হয় তিন তালাক মুসলমান পুরুষের আল্লা প্রদত্ত অধিকার। বিয়ের পর স্বামীর চোখে স্ত্রী ক্রীতদাসী। যৌন সঙ্গিনী মাত্র। তার একমাত্র কাজ পুত্র সন্তান প্রসব করা। ক্রীতদাসীর কোনরকম অধিকার থাকতে পারে না। তাই স্ত্রীকে তালাক দিলে তার খোরপোশের দায়িত্ব নিতে হয় না স্বামীকে। মুসলমান সমাজে এই অন্যায় অত্যাচার চলে আসছে বিনা বাধায়। মুসলমান ভোট হারাবার ভয়ে দেশের কোনো রাজনৈতিক দলই তিন তালাক নিষিদ্ধ করতে উদ্যোগ নেয়নি। তথাকথিত বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা সব কিছুতেই প্রতিবাদ করেন। দেশের মানুষকে প্রগতিশীল সমাজ গড়ার লম্বা চওড়া প্রতিশ্রুতি দেন। স্বপ্ন দেখান। তাঁরাও মুসলমান মহিলাদের মানুষের মর্যাদা দেননি। বরং বিরোধিতা করেছেন।

সবচেয়ে অবাক করেছেন তৃণমূল নেত্রী। তিনি আগাম ঘোষণা করেছিলেন যে তিন তালাক বিল সংসদে পেশ করা হলে তাঁর দলের সাংসদরা তীব্র প্রতিবাদ করবেন। তিনি নিজের রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ অন্দোলন গড়ে তুলবেন। কোথায় গেল সেই মিথ্যা অসার গর্জন। বাস্তবে যা ঘটলো তা হচ্ছে লোকসভায় তিন তালাক বিল নিয়ে আলোচনা বা ভোটাভুটিতে অংশ নিল না মমতার দল। সেদিন (২৮ ডিসেম্বর) তাঁরা সংসদ ভবনে তৃণমূলের জন্য বরাদ্দ ঘরে সারাদিন কফি সহযোগে জোর আড্ডা দিলেন। কংগ্রেস তিন তালাক নিষিদ্ধ করে আনা বিলটিকে সমর্থন করায় দিদির মোল্লা-প্রীতি চটকে গেল।

গূঢ় পুরুষের কলম

দিদির উপর ভরসা রেখেছিল সিপিএম, বিজেডি, আর জে ডি, মুসলিম লিগ এবং সমাজবাদী পার্টি। কিন্তু তিন ঘণ্টা ধরে চলা বিতর্কে তৃণমূল সাংসদদের অনুপস্থিতি বেজায় বিপদে ফেলেছে তাদের। এখন আর বুক বাজিয়ে বলতে পারছে না তারাই ইসলামের সাচ্চা বান্দা। অর্থাৎ, মমতা এবং রাহুল গান্ধীর উপর ভরসা রেখে তাদের আম ও ছালা দুইই বরবাদ হয়েছে। এরপরে রাহুল-মমতা জুটির বিজেপি বিরোধী ফেডারেল ফ্রন্টের উপর তারা কতটা আস্থা রাখবে ভবিষ্যতে জানা যাবে।

তিন তালাক বিলটির চরিত্রটা একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক্। ২০০২ সালে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি আর সি লাহোটির বেঞ্চ শামিস আরা বনাম উত্তরপ্রদেশ সরকার মামলায় তিন তালাকে বিবাহ বিচ্ছেদের দাবি করে স্বামীর খোরপোশ এড়ানোর চেষ্টা খারিজ করে দেয়। এর আগে ২০০১ সালে সুপ্রিম কোর্ট ডানিয়েল লতিফির মামলায় তিন তালাককে সংবিধান বিরোধী আখ্যা দিয়েছিল। মোদী সরকারের আনা বিলে প্রথমেই বলা হয়েছে, বিবাহিতা মুসলমান মহিলাদের অধিকার সংরক্ষণ করতে এবং তাঁদের স্বামীরা যাতে পরপর তিনবার তালাক উচ্চারণ করে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে এই বিল সংসদে আনা হয়েছে অনুমোদনের জন্য। এই বিলটির নাম, 'দ্য মুসলিম উইমেন প্রোটেকশন অব রাইটস অন ম্যারেজ, ২০১৭'। বিলে মোট তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে তালাক অর্থে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে তালাক-ই-বিদ্দতকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছদে বলা হয়েছে, তালাক উচ্চারণ করে বা লিখে বা এস এম এস করে স্বামী যদি তাঁর স্ত্রীকে পর পর তিন তালাক বলেন তাহলে সেটা বেআইনি বলে গণ্য হবে। স্বামী শাস্তির মুখে পড়বেন। শাস্তি তিন বছর পর্যন্ত জেল এবং জরিমানা হবে। এখানেই শেষ নয়। বিলটি তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, স্ত্রীকে খোরপোশ দিতে বাধ্য হবে স্বামী। কী পরিমাণ অর্থ খোরপোশ বাবদ স্বামীকে দিতে হবে তা ঠিক করে দেবেন ম্যাজিস্ট্রেট। তিন তালাক আইন ভঙ্গকারীকে জামিনে মুক্তি দেওয়া যাবে না। তিন তালাক জামিন অযোগ্য অপরাধ। অবাক হতে হয় তৃণমূল নেত্রীর বক্তব্য শুনে। নেত্রী বলেছেন, সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল তালাক-ই-বিদ্দত অসাংবিধানিক এবং ধর্মীয় অধিকার নয়। সুপ্রিম কোর্টের রায়ই দেশের আইন। সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণ অবৈধ বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেটাই যথেষ্ট ছিল কৃষকদের জমি ফেরাতে। আলাদা আইন করতে হয়নি। তাই লোকসভায় পেশ করা বিলটি অপ্রয়োজনীয়। নেত্রীর অসাধারণ যুক্তি! তিনি জানেন না এমন নয় যে কেন্দ্রীয় সরকার বিলটি এনেছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। তিন তালাককে বেআইনি ঘোষণা করে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দেয় ৬ মাসের মধ্যে সংসদে বিল পাশ করিয়ে আইন তৈরি করার। কারণ, থানায় স্বামীর বিরুদ্ধে বেআইনি তালাকের অভিযোগ জানালে পুলিশ বুঝতে পারে না কোন আইনে স্বামীকে গ্রেপ্তার করতে হবে। নেত্রীর কাছে সিঙ্গুরের জমি আন্দোলন এবং বিবাহিতা মুসলমান মহিলাদের স্বার্থরক্ষা একই রকম। অল ইন্ডিয়া মুসলিম উইমেন পার্সোনাল ল' বোর্ড-এর নেত্রী শাইস্তা অম্বর বলেছেন, 'মুসলমান মহিলারা বছরের পর বছর ধরে নিপীড়িতা। এতকাল কেউই তাঁদের কথা ভাবেননি।' হ্যাঁ, মোদী সরকার ভেবেছে। প্রতিকার করতে উদ্যোগ নিয়েছে। সেই উদ্যোগে জল ঢালতে মমতা, অখিলেশ, লালু, সূর্যকান্তরা কোমর বেঁধে লেগেছেন। ▮

‘মাতৃ’হারা ভারতী, রাজনীতিতে কোনো ‘মমতা’ নেই

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

২০১৭ গেল, ২০১৮ এল। কিছু রেশ রয়ে গেল। যেমন ভারতী ঘোষের ‘মাতৃ’হারা হওয়ার জের সহজে মেটার নয়। রেশ থাকবেই।

‘‘ব্যবহার করে ছুড়ে ফেলে দেওয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বভাব।’’ ভারতী ঘোষের বদলি প্রসঙ্গে এমনটাই মন্তব্য করেছেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। বড়দিনে পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপারের পদ থেকে ব্যারাকপুরে রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের তৃতীয় ব্যাটেলিয়নের কম্যান্ডিং অফিসারের পদে বদলি করা হয় ভারতী ঘোষকে। ভারতী ঘোষ একটা সময় পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী তথা শাসকদলের এতটাই ঘনিষ্ঠ আইপিএস ছিলেন যে বিরোধীরা বলত, ‘ভারতী ঘোষ পুলিশের পোশাকে মমতার একনিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মী।’

এমন কটাক্ষের কারণ কম ছিল না। প্রকাশ্য মঞ্চে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ‘মা’ ডেকেছেন, ‘বনদেবী’ ডেকেছেন, ‘জঙ্গলমহলের মা’ সম্বোধন করেছেন। কিন্তু তিনিই এখন শাসকের কোপে। বদলির জবাবে পদত্যাগ করে রাজ্য রাজনীতিতে ঝড় তুললেন ভারতী ঘোষ। একবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ‘মা সারদা’ এবং ‘মার্গারেট থ্যাচার’-এর সঙ্গেও তুলনা করেছেন ভারতী।

এক সময়ে তিনিই নাকি তৃণমূল দলটিকে চালাতেন পশ্চিম মেদিনীপুরে। স্থানীয় নেতাদেরও বিবাদ মেটাতে দ্বারস্থ হতে হতো পুলিশ সুপারের কাছেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একান্ত ঘনিষ্ঠ আইপিএস অফিসারের এক ডাকে কাঁপতেন শাসকদলের নেতারাই।

সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ অফিসারের বদলিতে অনেকেই মুকুল রায়ের সঙ্গে ভারতীর ঘনিষ্ঠতার ছায়া দেখছেন। তবে এই অফিসারের বদলিতে তৃণমূলের দুই

নেতার ক্ষমতার তেজ দেখা গেল। একজন শুভেন্দু অধিকারী ও অন্যজন ‘ভাইপো’ অভিষেক।

কানাঘুষো শোনা যায়, এখন শাসকদলের হয়ে পুলিশ-প্রশাসনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো হওয়ার সুবাদে তাঁকে ঘিরেই এখন প্রশাসনের ওঠা বসা।

তৃণমূল নেতারা প্রকাশ্যে এই জল্পনাকে উড়িয়ে দেন এক কথায়। কিন্তু ভারতীর নামে অভিযোগ ধীরে ধীরে জমা হচ্ছিল কালীঘাটে। নজর রাখছিলেন অভিষেক। তাঁর সঙ্গে ভারতীর সুসম্পর্ক হয়নি কখনওই।

একথা অস্বীকারের উপায় নেই, তৃণমূলে যোগদান করার সময় যাঁর হাত থেকে পতাকা নিয়েছিলেন, সেই অভিষেককেই গুরু মেনে নিয়েছেন নব্য তৃণমূল সাংসদ মানস ভুঁইয়া। অভিষেকের কাছে সর্বশেষ অভিযোগ আসে মানসের তরফেই। সবং নির্বাচনে পুলিশ সুপারের ভূমিকা নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতীর দূরত্ব কয়েক মাস ধরেই বাড়ছিল। এই সুযোগে শেষ পেরেকটি পোঁতেন অভিষেকই। শুধু দল নয়, প্রশাসনের কাছেও তাজা বার্তা যায়, শাসক দলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে শেষ কথা বলবেন অভিষেকই।

অন্যদিকে শুভেন্দু অধিকারীও এই সুযোগে ভারতীকে সরিয়ে নিজের পছন্দের পুলিশ অফিসারকে পশ্চিম মেদিনীপুরে বসাতে পেরে খুশিই হবেন। শুভেন্দুর খাসতালুক পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার ছিলেন অলোক রাজোরিয়া। তাঁকেই পশ্চিমে নিয়ে গিয়ে সেই জেলাকেও নিজের কবজার মধ্যে আনলেন শুভেন্দু। অলোক রাজোরিয়া এর আগে ঝাড়গ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে কাজ করেছেন। ফলে জঙ্গলমহলের এই অংশ তাঁর কাছে অচেনা নয়। অলোকের উপস্থিতিতে শুভেন্দুও স্বচ্ছন্দে পশ্চিম মেদিনীপুরে দলের সংগঠন সামলাতে পারবেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পুলিশ সুপারের হটলাইন কাজ করবে না এই মুহূর্তে।

বিজেপিকে সামলাতে নতুন পুলিশ সুপারই হয়ে উঠবেন একদা মুকুল-বিরোধী দুই তৃণমূল নেতার বড় ভরসা।

—সুন্দর মৌলিক

তথাকথিত বিজ্ঞজনদের ধর্মগত বিদ্বেষ তাঁদের চিন্তাকে বিষাক্ত করে তুলেছে

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

কিছুদিন আগে একটা কলেজের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ড. শামসুল আলম এক দীর্ঘ প্রবন্ধের মাধ্যমে নানা বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তার ছত্রে ছত্রে রয়েছে অজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্কীর্ণতার বিশ্রী মিশ্রণ। তাতে প্রবন্ধটি এক অপাঠ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

তিনি লিখেছেন--- তাজমহল, কুতুবমিনার, বাবরি মসজিদ ইত্যাদিকে আদতে মন্দির বলে দাবি করা হয়েছে। তাজমহল বা কুতুব মিনার মন্দির ছিল বলে কে দাবি করেছেন জানি না। তবে বাবরির কথাটা একটু বলা দরকার।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাসের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ড. মাখনলাল রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'বাবর অযোধ্যা বিজয়ের পর শ্রীরামচন্দ্রের বাসভূমি অযোধ্যার মন্দির ধ্বংস করেন এবং উহার উপর মসজিদ নির্মাণ করেন'--- (ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয়, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯)।

বাবরের নির্দেশে তাঁর সেনাপতি মীর বাকি খাঁ কাজটা করিয়েছিলেন বলে ঐতিহাসিক ড. কে. এস. লাল মন্তব্য করেছেন। তাঁর ভাষায়— 'In 1528-29, Mir Baqui, a Mughal commandor, by Babar's order, destroyed the temple at Ayodhya, commeramoting Lord Rama's birthplace and built a mosque in its place by an inscription on it'— (মুসলিম স্টেট ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ৬৫৬)।

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক জাহান আয়েষা সিদ্দিকিও এই কথা লিখেছেন তাঁর গ্রন্থে— (ইসলামি শান্তি ও বিধর্মী-সংহার, পৃ. ২০)। তবে সমগ্র মন্দিরটি ভাঙা যায়নি প্রবল বাধার ফলে। নীচের অংশে রামচন্দ্র, সীতাদেবী, হনুমানের মূর্তি আছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। ক্রিস্টোফার জেফিলেটের মতে, অন্তত ৭৭ বার হিন্দুরা এই ব্যাপারে বাধা দিয়েছিলেন--- (ন্যাশানালিস্ট মুভমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডিয়ান পলিটিক্স, পৃ. ৪০২)। আচার্য ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারও মন্দিরের কথাটা স্বীকার করেছেন।

কিন্তু মসজিদ ভেঙে মন্দির করা হয়েছে বলে কখনও শুনিনি। জনৈক শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক জানিয়েছেন যে, 'ইন্ডিয়ান আর্কাইভস'-এর রেকর্ডে আছে— মুসলমান আমল থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত ৭৯৯৩টি মন্দির ভাঙা হয়েছে। বাংলাদেশে অনেক মন্দির ভেঙে দেওয়ায় হিন্দুরা সেবার নৈতিক প্রতিবাদ হিসেবে দুর্গাপুজোর বদলে শুধু ঘটপুজো করেছেন।

আমরা মনে করি— এই ভাঙাভাঙিটা সুস্থতার লক্ষণ নয়, কারণ মানুষ নিজের ধর্ম পালন করবেন— সেই সঙ্গে শ্রদ্ধা করবেন সব ধর্মকেই। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'যত মত তত পথ।' তিনি আল্লামন্ত্র নিয়ে তিনদিন ইসলামি ভাবে ছিলেন। আবার খ্রিস্টদেবকেও মানতেন— তাঁর সম্বন্ধে বলতেন 'ঋষিকৃষ্ণ'।

কিন্তু ড. আলমের মতো উচ্চশিক্ষিত মানুষরাও সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। এই শিক্ষার দাম কী? আসলে, কিছু মানুষ 'হিন্দু' কথাটাই সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু কিছুদিন আগে সুপ্রিমকোর্ট জানিয়েছেন— এটা শুধু একটা ধর্ম নয়— 'a way of life'। এর দর্শন হলো—দুনিয়ার সবাই আত্মীয়— 'বসুধৈব কুটুম্বকম্।' এর বাণী হল— 'সর্বে ভবন্তু সুখীনঃ'— সবাই সুখী হোন।

ড. আলমের মতে, বিজেপি-যুগে সর্বত্র দলীয় ব্যক্তিদের নিযুক্ত করা হচ্ছে— চলছে মতবাদ-ভিত্তিক নিয়োগ। কিন্তু এই অভিযোগও প্রমাণিত সত্যি নয়— সর্বত্র সঙ্কীর্ণতা ন্যায়নীতিকে গ্রাস করেনি। তবে দীর্ঘকাল ধরে এটাই তো চলে এসেছে। ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সিপিআই- ঘেঁষা নীতির কারণে বহু বাম অধ্যাপককে বিভিন্ন জায়গায় বসিয়ে দিয়েছিলেন। দীর্ঘদিনের বাম আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে শুরু করে স্কুলের বেয়ারাকেও কর্তৃপক্ষ বেছে নিয়েছেন রাজনৈতিক রঙ দেখে। যোগ্যতা নিরপেক্ষতার ব্যাপার তখনও ছিল না।

তিনি আরও লিখেছেন, ইতিহাসকে এখন বিকৃত করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে— আকবর নাকি রাণা প্রতাপের কাছে হলদিঘাটের যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু কোন বইতে এমন লেখা হয়েছে? দাবি করা হচ্ছে নাকি সব মুসলমান বাদশারা ছিলেন খলনায়ক। জিজ্ঞেস করি কোন ইতিহাস বইতে এমন লিখতে বলা হয়েছে— শেরশাহ-আকবর আর হুমায়ুন-ঔরঙ্গজেব একই ধরনের সম্রাট ছিলেন? ইতিহাসের সিলেবাস থেকে মুসলমান যুগকে তুলে দেওয়া হয়েছে? কোথায় বলা হয়েছে মুনি-ঋষি ও রাজাদের ইতিহাসই হলো ভারতের ইতিহাস?

এই কথাগুলো কোন কোন বইতে আছে— সেটা কি পূর্বোক্ত- শিক্ষাবিদ জানাবেন? তাহলে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি ঘটত। উক্ত লেখক গোরক্ষকদের তাণ্ডবেরও নিন্দা করেছেন। সেটা অবশ্যই নিন্দনীয় অপরাধ। হিংসা, বিদ্বেষ-প্রচার, হত্যা দৈহিক আঘাতের ব্যাপারকে যে কোনও সুস্থ ব্যক্তি অবশ্যই জঘন্য অপরাধ বলে মনে করবেন। কিন্তু কাশ্মীরের কয়েক হাজার হিন্দু

পণ্ডিতদের বিতাড়িত করা হলো, তাঁরা তাঁবু খাটিয়ে দিল্লি-হরিয়ানায় দিন কাটাচ্ছেন বহু বছর ধরে। তাঁদের কথা তো একবারও এই সব লেখকের মনে এল না! আর গুজরাটে করসেবকদের কী হলো? ৫৬ জনকে রেলের বন্ধ কামরায় পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার একটা তদন্ত কমিশন বসিয়েছিল। কিন্তু মহা উৎসাহে প্রাক্তন রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব আর একটা কমিশন বসিয়ে দিয়েছিল হঠাৎ। দাবি করা হয়েছিল করসেবকদের স্টোভ থেকেই আগুন লেগেছে। পরে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কমিশন জানিয়েছিল কোনও স্টোভই জ্বালানো হয়নি, আর কামরার দরজা ছিল বাইরে থেকে বন্ধ। এই নারকীয় ঘটনার নিন্দা-ধিক্কার কোনও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী করেছে?

ড. আলম শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেনের কথাও লিখেছেন। তিনি আর্টের কতটা বোঝেন জানি না। কিন্তু আমি আচার্য নন্দলাল বসুর এক অত্যন্ত প্রিয় ছাত্রের কাছে বছর তিনেক শেখার চেষ্টা করেছি এবং তার ফলে সামান্য একটু আধটু শিল্প-ধারণা জন্মেছে।

আচার্যদেব মাতা সরস্বতীর দুটো ছবি এঁকেছেন। 'বীণাবাদিনী' নামে দুটোই মাস্টারপিস। দেখলে ভক্তি-শ্রদ্ধায় মন আপ্লুত ও পবিত্র হয়। আর হুসেন কী এঁকেছেন? মায়ের নগ্নরূপ--- বিকৃত লাম্পট্যের যেন বহিঃপ্রকাশ। 'ভারতমাতা'র নগ্ন মর্তিও তাঁর বিকার-ভাবনা। একটা ছবিতে আছে নগ্ন সীতামাতাকে নিয়ে হনুমান চলেছেন--- তাঁর লেজ (বলতে লজ্জা করছে) সীতা-মায়ের গোপনাঙ্গ ছুঁয়েছে। একটা ছবিতে আছে নগ্ন হনুমান পর্বত শিখরে, একটাতে পার্বতী ষাঁড়ের সঙ্গে সঙ্গমে-রত, অন্যটাতে সহবাস-রত লক্ষ্মীদেবী। এগুলো কোটি কোটি দেশবাসীর মনকে আঘাত করে না? কেউ কেউ তাঁর বাড়ির স্টুডিয়ো তাই ভাঙচুর করেছে। আসলে পূর্বোক্ত লেখকদের মতো অনেকেরই রয়েছে 'আইডেন্টিটি-ক্রাইসিস।' ইরাক, মিশর, সৌদি প্রভৃতি দেশ কিন্তু আধুনিকতার দিকে এখন এগোলেও 'the vested interests among the Indian Muslims are guided by medievalism'--- (ড. হরিহর দাস--- ইন্ডিয়া, পৃ. ৪০৩)। অনুরূপভাবে ড. জে.সি. জোজারি লিখেছেন, 'the Muslim communalists take a very conservative view'--- (ইন্ডিয়ান পলিটিক্স, পৃ. ২৮২)। এর পরিবর্তন হবে না?

ড. আলম আরও জানিয়েছেন যে, গৈরিকীকরণের প্রয়াস দেশে একটা বিপদের সৃষ্টি করে চলেছে। এখনকার অনেক স্বল্প শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী, লেখক ও সাংবাদিক এই কথাটা অজ্ঞতাবশত লিখে থাকেন। এটা এসেছে 'গৈরিক' বা 'গেরুয়া' থেকে--- সেটা কিন্তু সততা, ন্যায়, সত্য, পবিত্রতা ও ধর্মের প্রতীক। তাই সাধু-সন্ন্যাসীদের পরিধেয় বস্ত্রের রং গৈরিক। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে--- শিবাজীকে তাঁর গুরু রামদাস বলেছেন--- 'বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো'--- অর্থাৎ দেশকে পবিত্র, স্বচ্ছ এ ধর্মভিত্তিক করে নিতে হবে। আমাদের জাতীয় পতাকার ওপরের অংশ তাই গৈরিক।

বিজেপি ও তার সঙ্গীরা যদি সবাইকে দলে টানতে চায়, তাহলে সেটা জঘন্যতম অপকর্ম। কিন্তু গৈরিকীকরণ তো একটা মহৎ কর্ম। তিনি ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে লিখেছেন, প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক উন্নতি এখনকার সীমা ছুঁয়েছে বলে নাকি দাবি করা হয়েছে। এই সব প্রলাপোক্তি তিনি কোথায় পেয়েছেন, সেটা কিন্তু তিনি জানাতে পারেননি। তবে এটা ঠিক যে, প্রাচীন ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প; সঙ্গীত, ভাস্কর্য, বাস্তুশাস্ত্র, ভেষজবিদ্যা ইত্যাদি যে স্তরে পৌঁছেছিল, জানলে গর্বে বুক ভরে যায়।

পাঁচ হাজারেরও বেশি বছরের আগে যে ভারতে 'সিন্ধু- সভ্যতা'-র নিদর্শন 'পাওয়া গিয়েছে মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায়, সেটা দেশ-বিদেশের পণ্ডিতদেরও বিস্মিত করেছে— (হুইলার— দ্য ইন্ডাজ এজ, পৃ. ৬)। তখন ইটের তৈরি রাস্তা ও বাড়িঘর ছিল, ছিল জল-নিকাশি ব্যবস্থা, মাটির নীচে নর্দমা ও বিশাল সর্বজনীন স্নানাগার। স্বচ্ছন্দ ও উন্নত নাগরিক জীবনের বহু ব্যবস্থা এক আশ্চর্য উন্নয়নের প্রমাণ রেখে গিয়েছে। ব্রোঞ্জ ও তামার পাত্র ছিল অজস্র। পশুপাখি ও নরনারীর ছবি ও মূর্তি দেখে বোঝা যায় শিল্পীদের শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধেও গভীর জ্ঞান ছিল। জানা গিয়েছে— মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গেও ভারতের যোগ ছিল। যোগ ছিল সুমেরু, আকাদ, ব্যাবিলন; মিশর ও আশিরিয় সভ্যতার সঙ্গেও। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, এটা গড়ে উঠেছিল খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ বছর আগে— 'if not earlier still'— (এন্সিয়েন্ট ইন্ডিয়া, পৃ. ২০)। রামশরণ শর্মা জানিয়েছেন, তখন রুপারও চল ছিল। অনেক বস্ত্রশিল্পও গড়ে উঠেছিল, নৌকো নির্মাণ হতো। পাথরের অলঙ্কারও হতো, তখন এক্কাগাড়িও ছুটত— (প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, অনুবাদ : সুমন চ্যাটার্জী, পৃ. ৪৫-৪৬)।

পূর্বোক্ত লেখক শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে লিখেছেন, রামায়ণ-মহাভারতে নাকি পারমাণবিক বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্রের কথা আছে। তিনি কোন্ বইতে ওটা পেয়েছেন, জানি না—সেটা সম্ভবত তাঁরই লেখা।

তিনি গণিত নিয়েও ব্যঙ্গ করেছেন। কিন্তু 'শূন্য' এই দেশেই আবিষ্কৃত হয়েছে। ত্রৈরাশিক, ছন্দগণিত (permutation-combination) প্রাচীনকালের হিন্দুরা জানতেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চাও তখন দারুণভাবে চলত। আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্য প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তি প্রচুর গণিতচর্চা করেছেন। বীজগণিতের চর্চাও তখন প্রচলিত ছিল। প্রাচীনকাল থেকেই জ্যামিতিরও চলন ছিল— (ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, পৃ. ৯০-৯৪)।

হয়তো রামায়ণ বর্ণিত মেঘনাদের আকাশ-যুদ্ধ পরবর্তীকালে বিমান আবিষ্কারের ব্যাপারে প্রেরণা দিয়েছে, 'অগ্নিবাণ' ন্যাপাম বোমা' সৃষ্টিতে বা 'বরুণবাণ' থেকে জল-কামানের ধারণা এসেছে আধুনিক কালে। এভাবেই হয়তো কল্পনা উজ্জীবিত করেছে বিজ্ঞান-চেতনাকে। আসলে, ওই সব তথাকথিত বুদ্ধিজীবী 'ভারতবাসী' হলেও 'ভারতীয়' নন। তাই তাঁদের ধর্মগত বিদ্বেষ তাঁদের চিন্তাকে বিষাক্ত করে তুলেছে। ■

সীমান্তে যেখানেই আঘাত আসবে কঠোর প্রত্যুত্তর দিতে হবে

মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অ: প্রা:)

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত স্বাধীন হয়েছে, ভারতের ভূখণ্ড নিয়ে স্বাধীন পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে। স্বাধীনতার শর্ত হিসেবে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য ভারতে অঙ্গীভূত হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান সেই শর্ত মানেনি। সামরিক আক্রমণ করে জম্মু-কাশ্মীর দখল করে নেওয়ার প্রয়াস তাদের জন্মলগ্ন থেকেই। ভারতের সামরিক বাহিনী যখন পাক-বাহিনীকে হঠিয়ে সমস্ত অঞ্চল পুনর্দখল করছে মাউন্ট ব্যাটেনের পরামর্শে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে মীমাংসার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের দ্বারস্থ হলেন। কিন্তু আজও কোনো মীমাংসা হলো না। মাঝখান থেকে পাকিস্তান জম্মু-কাশ্মীরের যে অঞ্চলটুকু দখল করেছিল, আজাদ কাশ্মীর নাম দিয়ে আজও তা ধরে রেখেছে।

১৯৬৫-তে সে আবার জম্মু-কাশ্মীর আক্রমণ করে। কিন্তু এবার ভারত মূল পাকিস্তানের লাহোর এবং সিয়ালকোট অঞ্চলের অনেকটা অঞ্চল অধিকার করে নেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বন্ধ হয়। পাক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাসখন্দে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ভারত পাকিস্তানকে কাশ্মীরের হাজিপীর পাস-সহ সমস্ত অধিকৃত অঞ্চল ফিরিয়ে দেয়। স্থির হয় অস্ত্রবিরতি রেখা। কিন্তু কাশ্মীর পাকিস্তানের কাছে এমন একটা বিষয় হয়ে দাঁড়ায় যা পাকিস্তানের সমস্ত অভ্যন্তরীণ অশান্তি দূর করতে এক মোক্ষম অস্ত্র হিসাবে দেখা দেয়। ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের জম্মু-কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি এবং অস্ত্রবিরতি রেখা উত্তপ্ত করে রাখতে পারলে পাকিস্তান টুকরো টুকরো হয়ে যাবে না, বরং একজোট হয়ে ঘুরে দাঁড়াবে এবং অভ্যন্তরীণ সমস্যা ভুলে যাবে। পাকিস্তান এত বছর ধরে এই সুযোগের ব্যবহার করে চলেছে। প্রায় প্রতিদিন ভারতের বিভিন্ন ঘাঁটি ও তৎসংলগ্ন গ্রামগুলির উপর অস্ত্র প্রহার করে চলেছে। এত প্ররোচনা সত্ত্বেও ভারত অস্ত্রবিরতি চুক্তি উল্লঙ্ঘন করেনি।

১৯৭১-এ আবার পাক-ভারত যুদ্ধ হয় এবং পূর্ব-পাকিস্তান বাংলাদেশ নামে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পূর্ব পাকিস্তান হারিয়ে পাকিস্তান যখন দিশাহারা অবস্থায়, তখন কাশ্মীর দখল করা তার কাছে একটা মরণপণ যজ্ঞ হয়ে ওঠে। তৎকালীন পাক প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক বুঝে গেলেন সম্মুখ সমরে পাকিস্তান কোনোদিনই কাশ্মীর জয় করতে পারবে না। ফলে স্ট্রাটেজি পালটিয়ে ছায়াযুদ্ধের পথ বেছে নেন। অস্ত্রবিরতি রেখা বানচাল করে শুধুমাত্র জম্মু-কাশ্মীরই নয়, সংলগ্ন পঞ্জাব প্রদেশেও অস্ত্র প্রহার আরম্ভ করে। বহু ভারতীয় সৈনিক ও সাধারণ গ্রামবাসী এর ফলে হতাহত হয়ে চলেছেন। সেই সঙ্গে কট্টর ইসলামি সংগঠন গঠন করে মাদ্রাসার ছাত্রদের জেহাদি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী করে তাদের জম্মু-কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করিয়ে ভারতে সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটিয়ে চললেন।

পাক আই এস আই এই জেহাদিদের অস্ত্র, গোলাগুলি, অন্য সব উপকরণ দিয়ে তাদের ভারতের বিরুদ্ধে ছায়াযুদ্ধ পরিচালনা করে চলেছে। লস্কর-ই-তৈবা, জয়েস-ই-মুহম্মদ ইত্যাদি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী ভারতের বিরুদ্ধে এবং হাক্কানি তালেবান গোষ্ঠী আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে নিরন্তর সন্ত্রাস ঘটিয়ে চলেছে। সমস্ত বিশ্ব আজ অবগত যে পাকিস্তান একটি সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র। তারা সন্ত্রাসবাদী তৈরি করে। তাদের এবং অন্য রাষ্ট্রের সন্ত্রাসবাদী (ইসলামিক) গোষ্ঠীগুলিকে আশ্রয় দেয় এবং রাষ্ট্রীয় স্তরে ভারত ও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। ৯/১১ মুম্বই হামলা, পাঠানকোট সামরিক বিমান বন্দরে হামলা, জম্মুর নানা প্রান্তে, পুনা, কেরল ইত্যাদি অঞ্চলে সন্ত্রাসের ঘটনা সকলেই জানেন।

কিন্তু বর্তমান ভারত সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের যেমন প্রয়াস করেছে, তেমনি সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত সৈনিকদের আত্মরক্ষার নিমিত্ত পাকিস্তানি সৈন্যরা অস্ত্রবিরতি লঙ্ঘন করে গোলাগুলি ছুঁড়লে, যোগ্য জবাব দেওয়ার অধিকারও প্রদান করেছে। এর ফলে ভারতীয় সৈনিকদের মনোবলও অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছে। সেইসঙ্গে সীমান্তে গোলাগুলি আদান-প্রদানও অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছে। মাত্র বছর খানেক আগে ভারতের সীমান্ত রক্ষীদল যখন তারের বেড়ার ধার দিয়ে প্রহরায় যাচ্ছিল, পাকিস্তানের সীমান্ত প্রহরীদল (বর্ডার অ্যাকসান টিম) তাদের উপর অস্ত্র প্রহার করে, মর্টার গোলা ফেলে তাদের নিহত করে এবং সামরিক নিয়ম-শৃঙ্খলার ঘৃণ্যতম অবমাননা করে এক ভারতীয় জওয়ানের মাথা কেটে নিয়ে গিয়ে পাক সামরিক অধিকর্তার হাতে নিবেদন করেছিল। কার্গিলের যুদ্ধে ক্যাপ্টেন কালিয়া পাকসেনার হাতে যুদ্ধবন্দি হয়েছিলেন। তাকে পাকসেনারা হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তার যৌনাঙ্গেরও বিকৃতি তারা করেছিল। তার পার্থিব শরীর ভারতকে প্রত্যার্পণ করলে এই তথ্য সকলে জানতে পারেন। অবশ্য ১৯৭১-এ পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিকদের উপর পাক সেনারা যে ধরনের ঘৃণ্য বর্বরতার নিদর্শন রেখেছিল, পশ্চিম সীমান্তে একই নিদর্শন ভারত প্রত্যক্ষ করেছে।

ভারত সরকার মনে করেছিল, অনেক হয়েছে, এবার তাদের শাস্তি দেওয়ার সময় হয়েছে। উরি অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে প্রায় ১৮ জন

ভারতীয় সৈন্যকে নিধন করার পর ভারতের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। নিয়ন্ত্রণরেখার নিকটে পাক-সন্ত্রাসবাদীদের চৌকি নিশানা করে ভারতের কম্যান্ডো বাহিনীকে আক্রমণের নির্দেশ দেওয়া হয়। তারা পাক-অধিকৃত ভূখণ্ডে প্রবেশ করে সেই সব ঘাঁটিগুলিকে গুঁড়িয়ে দিয়ে নিঃশব্দে ফিরে আসে। এর নাম দেওয়া হয় 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'। বিশ্বব্যাপী এই নাম আজ ছড়িয়ে পড়েছে। মাত্র এক সপ্তাহ আগে, ভারতীয় সেনার একটি দল মেজর পদের এক অফিসারের নেতৃত্বে সীমান্ত সুরক্ষায় ছিলেন। পাকিস্তানের বর্ডার অ্যাকসান টিম তাদের নিশানা করে প্রচণ্ড অস্ত্রপ্রহার করে, এমনকী নিকটবর্তী পাক-ঘাঁটি থেকেও গোলাবর্ষণ করা হয়। মেজর-সহ চারজন ভারতীয় সৈনিক এই আক্রমণে শহিদ হন। ওই সেনাদের ব্রিগেড কম্যান্ডার মনে করেন, এই অন্যায় আক্রমণের শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন। তিনি এক পদাতিক ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডারকে আদেশ দেন অবিলম্বে সীমান্তের নিকটবর্তী পাক-সামরিক ঘাঁটিতে আঘাত করে (রেইড) উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতে। প্রতিটি ব্যাটালিয়নে একটি করে প্রশিক্ষিত কম্যান্ডো প্ল্যাটুন থাকে যাদের বলা হয় 'ঘাতক'। ব্যাটালিয়ন কম্যান্ডার ঘাতক প্ল্যাটুনের জনদশেক জওয়ানকে নির্দেশ দেন কোন পাক-পোস্টে কতটা আঘাত করতে হবে। সন্ধ্যার আলোআঁধারিতে তারা পাক এলাকায় প্রবেশ করে ওই পোস্টের খুবই কাছে একটি আই-ই-ডি (ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইজ) বসিয়ে সরে আছে। সেই বোমাটি ফাটার সঙ্গে সঙ্গে ওই পোস্টের সৈনিকরা বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। ঘাতকরা এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করছিল। তারা পাকসৈন্যদের ওপর অস্ত্র-প্রহার করে এবং ভারতীয় নিয়ন্ত্রণের অঞ্চলে ফিরে আসে। জানা যায় পাক সৈন্যদের বেশ কয়েকজন হতাহত হয়েছে।

যুদ্ধ এবং প্রাণনাশ সৈনিক অথবা সাধারণ মানুষের সবটাই দুঃখজনক। কিন্তু যখন 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি' তখন আঘাত করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। এই আঘাতের কাজটি মাত্র ৪৫ মিনিটের মধ্যেই সমাধা হয়েছিল। আমার বিশ্বাস, ব্রিগেড কম্যান্ডার নিজ দায়িত্বে এই কাজটি করিয়ে ভারতীয় সৈনিকদের মনোবল বাড়িয়েছেন।

অন্যদিকে পাকিস্তান তারস্বরে চিৎকার করে বিশ্ববাসীকে বোঝাতে চাইছে তারা সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র নয়, বরং সন্ত্রাসবাদের শিকার। বালুচিস্তানে সন্ত্রাসের ঘটনা মাঝে মাঝেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, পাকিস্তান জানাতে চাইছে তার পিছনে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'- এর হাত আছে। সমস্ত বিশ্ব পাকিস্তানের এই প্রলাপ বিশ্বাস না করলেও একমাত্র চীন তার সমর্থন জানিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে জানিয়ে দিয়েছে, তারা এই তথ্য বিশ্বাস করতে পারছে না কারণ তাদের হাতে কোনো প্রমাণ নেই।

পাকিস্তান এখন প্রমাণ কোথায় পাবে? অর্থাৎ প্রমাণ প্রস্তুত করতে হবে। কুলভূষণ যাদব বলে একজন অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় নৌ-সেনা অফিসার কর্মপোলক্ষে ইরানে অবস্থান করছিলেন। তাঁকে ইরান থেকে অপরহণ করে পাকিস্তানে সঙ্গোপনে নিয়ে আসা হয় এবং প্রচার করা হয় তিনি ভারতীয় গোয়েন্দাবাহিনী 'র'-এর প্রেরিত একজন চর। বালুচ বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে বালুচিস্তান সংলগ্ন ইরানে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। তিনি পাক সুরক্ষা বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছেন এবং এক সামরিক আদালত তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। তিনি নাকি বালুচিস্তানের কোনো হোটেলে কিছু চীনা কর্মীর নিধনে বালুচ বিদ্রোহীদের সহায়তা করেছেন। ভারতীয় দূতাবাসের কোনো অধিকারীর সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। সামরিক আদালতে কী সাক্ষ্য-প্রমাণ জমা পড়েছে তারও কোনো তথ্য ভারতীয় দূতাবাসকে জানানো হলো না। বাধ্য হয়ে ভারত হেগে'র আন্তর্জাতিক আদালতে এই বিষয়ের বিচার প্রার্থনা করে। আন্তর্জাতিক আদালত প্রথমেই নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁদের রায় না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা যাবে না।

প্রথমে পাকিস্তান কুলভূষণ যাদবের মা ও স্ত্রীর সঙ্গেও তার দেখা করার সুযোগ দেয়নি। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর চেষ্টায় অবশেষে পাক-সরকার তাঁদের কুলভূষণের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্র বিভাগের কোনো অফিসারের যাওয়ার ভিসা ছিল না। তাঁরা একাই গেলেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে পাকিস্তান সরকার যে অভব্য আচরণ করছে তা বিশ্বের ভদ্র সমাজকে লজ্জিত করবে। তাঁর স্ত্রীর গলার মঙ্গলসূত্র খুলে নেওয়া হলো, কপালের টিপও তুলে নেওয়া হলো। জুতো চটি খুলে খালি পায়ে মা ও স্ত্রী কুলভূষণকে দেখতে গেলেন। 'কেমন আছ?' প্রশ্নেও তিনি শেখানো বুলি কাঁচের দেওয়ালের ওপার থেকে আউড়ে গেছেন। তাঁর স্ত্রী সোজাসুজি বললেন, 'শেখানো বুলি ছেড়ে আমার কথার উত্তর দাও।' যখন গ্রাম্য ভাষায় তিনি স্বামীকে প্রশ্ন করলেন, পাক পররাষ্ট্র দপ্তরের অফিসার বলতেই দিলেন না। তাঁরা যখন ফিরে এলেন, তাঁদের চটি-জুতো ফেরত দেওয়া হলো না। এখন বলা হচ্ছে চটিতে কোনো 'লোহা' জাতীয় কিছু আছে। হয়তো কোনো ধরনের চিপ তাঁরা চটির মধ্যে ঢুকিয়ে কিছু প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন। ভারতীয় লোকসভায় এ বিষয়ে ধিক্কার প্রস্তাব তোলা হয়।

এই অবস্থায় তাহলে ভারতকে কোন পথে হাঁটতে হবে? ভারত এতদিন শান্তি প্রতিষ্ঠার পথেই চলেছে। যার জন্য দক্ষিণ এশিয়ার ছোট রাষ্ট্রগুলি ভারতের আর্থিক অথবা সামরিক ক্ষমতার উপর সন্দেহ প্রবণ হয়ে উঠছে। তারা ক্রমশই চীনের হাতের মুঠোর মধ্যে চলে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় কাশ্মীরে উন্নয়নের ঝড় তুলতে হবে, ব্যবসা, বাণিজ্য এবং কর্মের সংস্থান করতে হবে। যাতে একজন যুবক এবং মহিলা যেন বেকার না থাকেন। অন্যদিকে সীমান্তে যেখানেই আঘাত আসবে, কঠোর প্রত্যুত্তর দিতে হবে। পাক সামরিক অধ্যক্ষ জেনারেল জুনজুয়া মাত্র কয়েকদিন আগে বলেছেন, পাক-সরকার যদি ভারতের সঙ্গে সু-সম্পর্ক গড়তে চান, পাক সামরিক বাহিনী তাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তার পরই সীমান্তের দুটি ঘটনা ঘটল। আবার লস্কর-ই-তৈবার প্রধান হাফিজ সঈদ রাজনৈতিক দল গড়ে নির্বাচনের আসরে নামতে চান। ভারত সরকারকে সব বিষয় খতিয়ে বিবেচনা করে পাকিস্তান সম্পর্কে বিদেশ নীতি গ্রহণ করতে হবে। ভুললে চলবে না হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের আত্মা বিশ্বে শান্তি, আত্মিক উন্নয়ন এবং জ্ঞানের সাধনা করে চলেছে। ▮

বালুচিস্তান থেকে নজর ঘোরাতেই কুলভূষণ কাণ্ডের ছক পাকিস্তানের

অভিমন্যু গুহ

এই প্রতিবেদন লেখার ঠিক কয়েকঘণ্টা আগে বালোচ নেতা হারবায়ার মারি-র বিবৃতি সামনে এসেছে। যাতে তিনি অভিযোগ করেছেন কুলভূষণ যাদবকে বালুচিস্তান থেকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তাঁকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় মদতপ্রাপ্ত ধর্মীয় মৌলবাদীরা ইরান থেকে অপহরণ করে পাক-বাহিনীর হাতে তুলে দেয় বলে মারি জানিয়েছেন। কুলভূষণ কাণ্ডের পুরো চিত্রনাট্যটা পাকিস্তান কীভাবে সাজিয়েছিল তা বোঝাই যাচ্ছে। গত ২৪ মার্চ যেদিন কুলভূষণ গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছিল পাকিস্তান, সেদিন বালুচিস্তানের ঠিক কোথা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা জানাতে পারেনি তারা। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করার অজুহাতে প্রাক্তন নৌ-অফিসার কুলভূষণকে গ্রেপ্তার করে আসলে বালুচিস্তান নিয়ে ভারতকে একটা বার্তা দিতে চেয়েছিল পাকিস্তান। ১৯৭১-এ রাজাকার বাহিনী বাংলাদেশে যে অত্যাচার, নৃশংসতা চালিয়েছিল, বালুচিস্তানে বর্তমানে পাকসেনার অত্যাচার তাকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে।

ভারত বালুচিস্তানে নাক গলাবে না, বিষয়টা সুনিশ্চিত করতে কুলভূষণ যাদবের মতো কারোকে পাকিস্তানের খুব দরকার ছিল। ভারত তথা গোটা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষকে সবক শেখানোর জন্য পাকিস্তানের শাসক-জঙ্গি এধরনের একটা চিত্রনাট্য তৈরি করে ফেলেছিল। অনেকদিন আগেই কুলভূষণকে মেরে ফেলত তারা, ভারত মাঝখান থেকে বিষয়টি আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে নিয়ে যাওয়ায় পাকিস্তান আর চট করে খুনটা করতে পারেনি বটে, তবে খুনে মেজাজ যে তাদের ষোল আনা বজায় আছে এবং আজ না হোক কাল কুলভূষণকে তারা খুন করবে সেই ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে— কুলভূষণের স্ত্রী-র সধবার বেশ খুলিয়ে তাঁকে বিধবার বেশ ধরতে বাধ্য করিয়ে।

সারা বিশ্ব পাকিস্তানের এই অমানবিকতায় চমকে উঠেছে, কিন্তু এতে তো আশ্চর্যের কিছু নেই। গোটা কুলভূষণ চিত্রনাট্যটাই যেখানে পুরোপুরি অমানবিকতা, নৃশংসতায় সাজানো; সেখানে তার মা, স্ত্রী-র সঙ্গে দেখা করাবার নাটকটিও তো অমানবিকই হবে। তবে মহম্মদ আলি জিন্নার জন্মদিন উপলক্ষে এই অমানবিকতার প্রকাশ, জিন্নার নাম ও কাজের প্রতি সুবিচার করেছে কোনো সন্দেহ নেই। ১৯৪৭-এ যে দেশটার জন্মই অমানবিকভাবে, তারপর থেকে মানব-সভ্যতায় একের পর এক আঘাত হেনে যে দেশে জঙ্গিতন্ত্র কায়েম থাকে, যারা একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীকে জঙ্গি জোগান দিতে চায়, যারা জঙ্গি নিয়ন্ত্রিত সেনা দ্বারা পরিচালিত হয় তারা মানবিক হবে এটা ভাবাটাই অন্যায়।

তবে কুলভূষণ কাণ্ড পৃথিবীর সামনে একটা বড়ো বাস্তবতা তুলে ধরেছে। এই পাক-নৃশংসতার হাত থেকে বালুচিস্তান সমেত পাকিস্তানের অবদমিত প্রদেশগুলি ও ওই দেশের শান্তিকামী নিরীহ নাগরিকদের উদ্ধারের দায় বিশ্বের রয়েছে। এঁদের উদ্ধার আর পাকিস্তানের জঙ্গিপনা খতম, পৃথিবীর শান্তি ফেরানোর দু'টি রাস্তা। এটা না হলে কুলভূষণ যাদবের মতো নিরীহ, 'র'-এর

সঙ্গে যার কোনো সম্পর্কের প্রমাণ পাকিস্তান দিতে পারেনি, এরকম আরও অনেকের প্রাণ সংশয় হবে, মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে।

কুলভূষণকে বালুচিস্তান থেকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, তার আরও প্রমাণ রয়েছে। পাকিস্তান কোনো বিদেশি নাগরিককেই বালুচিস্তানে প্রবেশের অনুমতি দেয় না। বালুচিস্তানে প্রবেশের আরও দু'টি রাস্তা হলো ইরান ও আফগানিস্তানের সীমান্ত। প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে কুলভূষণ ইরান সীমান্ত দিয়ে বালুচিস্তানে ঢুকেছিল। ঘটনাটা এমন সময় ঘটে যখন ইরানের প্রেসিডেন্ট হবার পর প্রথমবার হাসান রউহানি ইসলামাবাদ সফরে যান। পাকিস্তানের মতো ইরানের বিরুদ্ধেও বালুচ অধিবাসীদের সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো আচরণের অভিযোগ উঠেছে। পাক-আধিকারিকরা ক্রমাগত দাবি করছে যে কুলভূষণ নাকি ইরানের নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে এবং তাদের সাহায্য চাইতে বালুচিস্তানে ঢুকেছিল। ফলে কুলভূষণকে ভারতের সঙ্গে ইরানের জাঁতাকলেও যে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল তা স্পষ্ট। ইরানের বিভিন্ন ব্যাপারে সক্রিয়তা ইসলামাবাদ ভালোভাবে নেয়নি। ফলে কুলভূষণকে হাতিয়ার করা হয়েছিল তাদেরকেও সবক শেখানোর জন্য।

পাকিস্তানে কুলভূষণের সঙ্গে তাঁর মা ও স্ত্রীর সাক্ষাৎকারের ছবি

কারণ পাক অধিকৃত বালুচিস্তানের সঙ্গে ইরাক অধিকৃত বালুচিস্তানের একটা বড়ো তফাত হলো বালুচিস্তানের দরজা আন্তর্জাতিক ভাবে ইরান খুলে দিলেও পাকিস্তান খোলেনি। বালুচ নিয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশন থেকে বিদেশি সাংবাদিক, গবেষক প্রত্যেকেরই আগ্রহ রয়েছে সেখানকার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে জানার জন্য। ইরান অধিকৃত বালুচিস্তান থেকে পাক অধিকৃত বালুচে যাতে এরা না ঢুকে পড়ে সেই বার্তা দিতেও ব্যবহার করা হতে পারে কুলভূষণকে। হারবায়ার মারি-র বক্তব্য অনুযায়ী ইরান থেকে কুলভূষণকে তুলে এনে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে পাক-জঙ্গিরা।

তাই কুলভূষণ কাণ্ডের গোটা চিত্রনাট্যটাই যেখানে অমানবিক, সেখানে তার স্ত্রী ও মাকে তার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া পুরোপুরি প্রহসন। এই ঘটনাই আশানুরূপ ছিল। এখন প্রশ্ন, ভারত কী করতে পারে? কুলভূষণকে যে এখনও খুন করা হয়নি, এর জন্য অবশ্যই কৃতিত্ব ভারতের, বিষয়টি আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে তোলার জন্য। তবে দুর্জনের কখনও ছলের অভাব হয় না। ২০১১ সালে রেমন্ড ডেভিসের কথা অনেকেরই জানা। মার্কিন নাগরিক রেমন্ড তবু আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র লোক ছিল। দুজন পাকিস্তানিকে খুনের অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার নিয়ে বিশ্ব তোলপাড় হয়েছিল। আমাদের সামনে হাতে গরম সর্বজিতের উদাহরণ রয়েছে। মনে হচ্ছে কুলভূষণের কপালেও ভাগ্যের একই পরিহাস লেখা আছে।

কিন্তু এই ভাগ্যলিখন পাল্টাবার ক্ষমতাও ভারত সবকারেরই আছে। শুধু কূটনৈতিক প্রয়াস এবং আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার প্রক্রিয়ার ওপর আস্থা রাখলেই সমস্যা মিটবে না। ৭১-এ হানাদার বর্বর পাক-সেনার হাত থেকে বাংলাদেশকে মুক্তি দিতে যে সদর্থক প্রয়াস ভারত নিয়েছিল, আজ বালুচিস্তানের ক্ষেত্রেও একই প্রয়াস দরকার। এটা শুধু বর্বর অমানবিক পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় হতে পারে না। এর সঙ্গে মানবাধিকারের বিষয়টিও জড়িত। এবং পাক সেনা ও প্রশাসনের হাতে মানবাধিকার যে কতদূর লঙ্ঘন হতে পারে কুলভূষণ যাদব কাণ্ড তা পুনঃপ্রমাণিত করেছে।

কুলভূষণের মুক্তির জন্য সর্বাধিক চেষ্টা করার কথা সংসদে বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ জানিয়েছেন। কূটনৈতিক চাপের সঙ্গে সামরিক চাপ না বাড়ালে এই কার্যসিদ্ধি হওয়া মুশকিল। ■

ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করার অজুহাতে প্রাক্তন নৌ-অফিসার কুলভূষণকে গ্রেপ্তার করে আসলে বালুচিস্তান নিয়ে ভারতকে একটা বার্তা দিতে চেয়েছিল পাকিস্তান। ১৯৭১-এ রাজাকার বাহিনী বাংলাদেশে যে অত্যাচার, নৃশংসতা চালিয়েছিল, বালুচিস্তানে বর্তমানে পাকসেনার অত্যাচার তাকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

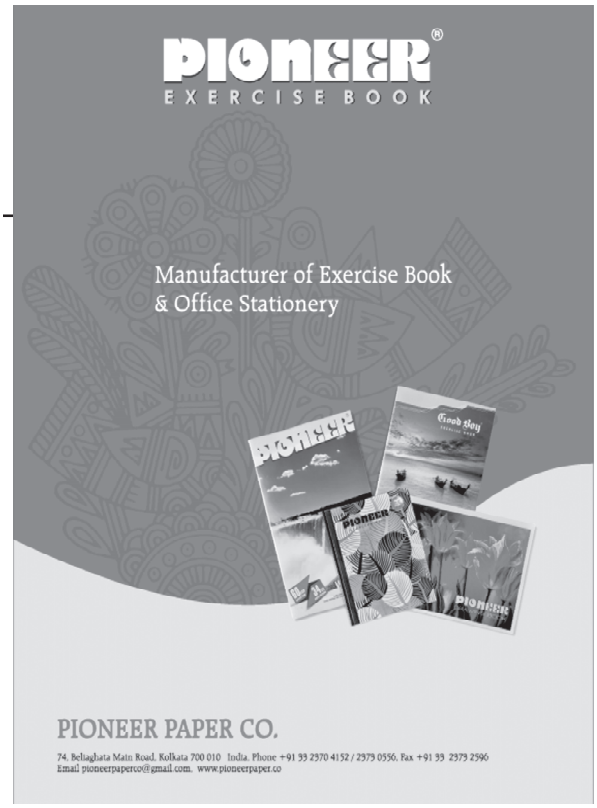

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

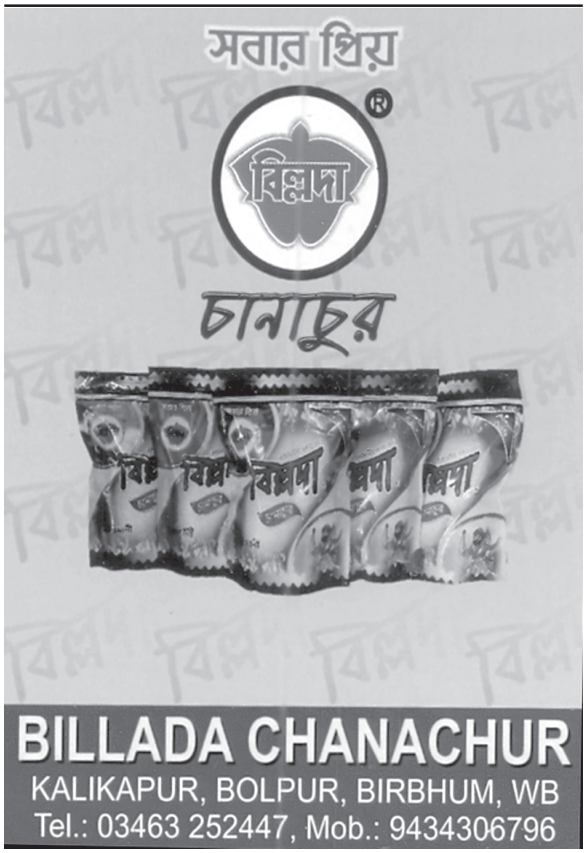

বাংলা অভিধানে নতুন শব্দবন্ধ 'দুষ্টু স্যার'

সন্দীপ চক্রবর্তী

বামফ্রন্ট সরকার যেদিন 'মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা'র ধুয়ো তুলে ইংরেজি তুলে দিল সেদিনই এরাজ্যে ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের একচেটিয়া আধিপত্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের সুদূরপ্রসারী ফল কী হবে বাম নেতারা ভালোই জানতেন। তবুও তারা সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন। কারণ মেকলে-প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতির ভূমিকা গৌণ। যেখানে ইংরেজিই প্রধান। পশ্চিমি ধ্যানধারণায় শিক্ষিত বাম নেতারা তাই 'মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা'— এই মুখোশের আড়ালে মাতৃভাষার গঙ্গাযাত্রা সুনিশ্চিত করেছিলেন। শহরবাসী কতিপয় বাঙালি এই নব্য শিক্ষানীতি লুফে নিয়েছিল। এমনিতেই বাঙালির ইংরেজিপ্রীতি সর্বজনবিদিত। অবশ্য সেই ইংরেজি শুধু একটি ভাষা নয়— কালচার, যার বাংলা নাম ইংরেজিয়ানা। কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি শহরের ইংরেজিমাধ্যম স্কুলগুলি আসলে ইংরেজিয়ানা শেখার ছাঁচ। বাঙালি শিশু তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে কিছুদিন হাত পা ছোঁড়ে, তারপর পুরোদস্তুর বিশ্বনাগরিক বনে যায়। কিন্তু সমস্যা হলো, সম্প্রতি এই ইংরেজিয়ানার সামনে বড়োসড়ো বাধা উপস্থিত হয়েছে, যার নাম 'দুষ্টু স্যার।'

ডিসেম্বরের গোড়ায় কলকাতার নামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জিডি বিড়লা স্কুলে যে ঘটনাটি ঘটেছে তারপর অনেক বাবা-মা'ই তাঁদের ছেলেমেয়েদের— বিশেষ করে শিশুকন্যাকে স্কুলে ভর্তি করতে ভয় পাচ্ছেন। তাদের রক্তচাপ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েকটি তথ্য। অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ৩০০টি শিশু নির্যাতনের অভিযোগ পুলিশের কাছে এসেছে। এসবই প্রোটেকশন অব চিলড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্সেস (পসবো)-র আওতায় পড়ে। খবরটি পাওয়া গেছে ওয়েস্টবেঙ্গল কমিশন ফর প্রোটেকশন অব চাইল্ড রাইটসের সূত্র থেকে। এই তথ্য থেকে পরিষ্কার, পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদিন সাতজন শিশু ধর্ষিত অথবা নির্যাতিত হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই পরিসংখ্যান শুধুমাত্র নথিবদ্ধ অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে তো বটেই, শহরেও এমন অনেক বাবা-মা আছেন যাঁরা তাঁদের শিশু বা কিশোরী কন্যা নির্যাতিতা হলেও সামাজিক লোকলজ্জার ভয়ে পুলিশকে কিছু জানতে দেন না। তাদের হিসেব ধরলে সংখ্যাটি যে আরও বাড়বে সেকথা বলাই বাহুল্য। ধর্ষিতাদের বয়স সাধারণ ৫ থেকে ১৬-র মধ্যে হয়ে থাকে। এদের বেশিরভাগই স্কুলের ছাত্রী। পুলিশ যত অভিযোগ পায় তার মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধর্ষক পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়, সৎবাবা— এমনকী নিজের বাবাও! সন্দেহ নেই ছবিটা ভয়াবহ। জি.ডি. বিড়লা স্কুলের ঘটনাটি জনসমক্ষে আসার পরেই বেহালার এম. কে. বিড়লা স্কুলের এক প্রাক্তন ছাত্রীর মা অভিযোগ করেন, তাঁর মেয়ের যখন চার বছরেরও কম বয়েস তখন ওই স্কুলের দু'জন কর্মী তার শ্লীলতাহানি করেছিল। পুলিশের কাছে অভিযোগ করেও তিনি সুবিচার পাননি। পুলিশের আধিকারিকেরা তাকে বলেছিলেন, অভিযোগ তুলে না নিলে তাঁর মেয়েকে কোনও সরকারি হোমে থাকতে হবে। বাধ্য হয়ে ওই মহিলা মেয়ের স্কুল বদলে দেন। তার অভিযোগও ধামাচাপা পড়ে যায়। এখানে একটি প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে, শিশু নির্যাতনের প্রতিকারে পুলিশ কতটা আন্তরিক? জি.ডি. বিড়লা স্কুলের ঘটনায় পুলিশের যে সক্রিয়তা দেখা গেছে, গ্রাম বা মফস্সলের ক্ষেত্রে কি দেখা যায়? উত্তর হলো না, যায় না। অথচ পশ্চিমবঙ্গে শিশু নির্যাতনের ঘটনা সব থেকে বেশি ঘটে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায়। তারপরই রয়েছে শিলিগুড়ি।

যেহেতু ইংরেজিমাধ্যম স্কুলগুলি শিশু নির্যাতনের ঘটনা সম্প্রতি ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে, তাই পুলিশের পাশাপাশি সিবিএসই-র মতো সংস্থার ভূমিকাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। কী ভাবছেন তারা? জানা গেছে স্কুলগুলির শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ নিয়েছে সিবিএসই। এছাড়া প্রতিটি স্কুলে সুস্থ পরিবেশ সৃজনের ওপর জোর দিচ্ছে। এমন একটি পরিবেশ যেখানে লিঙ্গবৈষম্য, ইভটিজিং এবং যৌন নির্যাতন থাকবে না। মেয়েরা যাতে আত্মরক্ষায় পারদর্শী হয়ে ওঠে তার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে সিবিএসই।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কথাও বলা দরকার। জি ডি বিড়লা স্কুলে শিশু ধর্ষণের ঘটনা ঘটার পর পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, মেয়েদের স্কুলে পুরুষ শিক্ষক কেন?' মন্তব্যটি নিয়ে ফেসবুকে যথেষ্ট হাসাহাসি হয়েছে। যাই হোক, জি ডি বিড়লা-কাণ্ডের পর রাজ্য সরকার একটি নির্দেশিকা প্রস্তুত করে প্রতিটি প্রাইভেট স্কুলকে পাঠিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, মেয়েদের সাহায্য করার জন্য প্রত্যেক ক্লাসে মহিলা কর্মী নিয়োগ করতে হবে। মহিলা কর্মী রাখতে হবে পুলকারেও। কোনও শিশু বাথরুমে গেলে তার সঙ্গে থাকবেন মহিলা কর্মী। এবং হ্যাঁ, শারীরশিক্ষার ক্লাস কোনও পুরুষ শিক্ষক নেবেন না। সুতরাং অবস্থা বেশ শোচনীয়। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে— এই আপ্তবাক্য মেনে আমরা এখন বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছি। একদিক থেকে এই সক্রিয়তা সমর্থনযোগ্য। কারণ হতভাগ্য শিশুটির অনাঘ্রাত শৈশব ফিরিয়ে দিতে না পারলেও এই সক্রিয়তা হয়তো ভবিষ্যতে শৈশবচুরি ঠেকাতে সমর্থ হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলায় বাস করে সেটাও কম পাওয়া নয়।

খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

দক্ষিণ কলকাতার জি.ডি. বিড়লা স্কুলটি কলকাতার একটি বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এবছর শেষ দিকে সেখানে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। বিকৃত কামনা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে দুইজন শিক্ষক নামধারী একটি শিশুকন্যার সঙ্গে যে ব্যবহার করলেন তা লিখতেও এই কলম কুণ্ঠা বোধ করছে। ঘটনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গণমাধ্যম তীব্র প্রতিক্রিয়া জানাল। শীতের মধ্যে বিপুল সংখ্যায় অভিভাবকদের একটি বিশাল জমায়েত বিদ্যালয় বন্ধ করে দিলেন। উগরে দিতে থাকলেন ক্ষোভ— ইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা যেন পদত্যাগ করেন, দাবি উঠল। শিক্ষককুলের পক্ষে লজ্জাজনক ওই বিকৃত-কাম দুই জনের বিরুদ্ধে ক্ষোভের আগুন ঝলসে উঠল। কয়েকদিন ধরে খবরের কাগজের সিংহভাগ দখল করে থাকল এই ঘটনাবলী। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন; শিক্ষামন্ত্রী একটু বিচিত্র মন্তব্য প্রকাশ করলেন : মেয়েদের স্কুলে এবার থেকে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ করা উচিত। সামাজিক গণমাধ্যমে লিখল কেউ কেউ— শহরের ইংরেজি মাধ্যম স্কুল বলেই এমন হইচই— গ্রামাঞ্চলে এরকম বহু ঘটনার কথাই তো জানা যায়। কেউ বললেন, মুখ্যমন্ত্রী তো মহিলা— তিনি কামদুনি-কাটোয়া-পার্কস্ট্রিটে নারী লাঞ্ছনার ক্ষেত্রে তো এমন প্রতিক্রিয়া জানাননি! আর শিক্ষামন্ত্রীর অসার উক্তি সম্পর্কে শুরু হলো হাসাহাসি রঙ্গতামাশা। কেউ তলিয়ে ভাবলেন না এই ঘটনা আর তার প্রবল প্রতিক্রিয়ার পিছনে বহু কারণ আছে, সেগুলির চর্চা হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

কিছুদিন আগে দিল্লির কাছাকাছি একটি নামকরা স্কুলের টয়লেটে একটি শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেখানেও একইরকম আবেগের ঢেউ খেলে যায়। অভিভাবক-আন্দোলনের চাপে সরকার তদন্ত করে বলে এক বাসচালক এই দুষ্কর্ম করেছে। ওই ছেলেটির সঙ্গে বিকৃত যৌন লালসা চরিতার্থ করে হত্যা করেছে এই নরবেশী পশু। তার কিছু পরেই যা জানা গেল তাতে আমরা আরও বিহ্বল হলাম। প্রকৃতপক্ষে এই ছেলেটির হত্যা, তথাকথিত দুর্ব্যবহারের জন্য ওই দরিদ্র বাসচালকের কিছু মাত্র যোগাযোগ নেই; ঘটনা ঘটিয়েছে উঁচু ক্লাসের অন্য এক অপরাধপ্রবণ ছাত্র। তার লক্ষ্য ছিল পরীক্ষা ভণ্ডুল করে দেওয়া। এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে যে তীব্র গোলযোগ হলো তার ফলে ওই অপরাধীর উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়। কিন্তু আমাদের দেশে বেসরকারি বিদ্যালয়, শিক্ষার প্রশাসন ও পরিবেশ সম্পর্কে যে ছবি উঠে এল তা ভয়াবহ বললেও কম বলা হয়। স্কুল-কর্তৃপক্ষ নাকি পুলিশকে প্রভাবিত করে ওই দরিদ্র বাসচালককে মিথ্যা অভিযোগে অপরাধী সাজিয়েছিল। বিষয়টি আমাদের মনে বহু প্রশ্ন তুলে ধরল। কোন সমাজে বাস করছি আমরা! এই অপরাধপ্রবণ অর্থলোলুপ ভ্রষ্ট আদর্শচ্যুত শিক্ষাপরিসরে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম জীবনের পাঠ নিচ্ছে? এ কোন গহন অন্ধ তমসার কালো চামড়া আমাদের শিক্ষাঙ্গনকে ঢেকে রেখেছে?

কলকাতার বিদ্যালয়টি সম্পর্কেও একই কথা। বিষয়গুলি থেকে আমাদের প্রশ্ন উঠে আসছে এই রকম :

১. স্কুলে শিশু-বালক-বালিকাদের উপর নির্মম-নিষ্ঠুর যৌন আচরণের সম্ভাবনা তৈরি হবার কথা নয়—অথচ তা হচ্ছে। বিশেষত যারা শিক্ষাদান করছেন, তাদের কাছে এই আচরণ শুধু অভাবিতপূর্বই নয়, এর কারণ বিচার, কারণ শনাক্ত করা গেলে তার মূল উচ্ছেদ করা জরুরি। শুধুমাত্র তর্জন গর্জন করে, মেয়েদের স্কুলে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ বন্ধের অপ্রস্তুত মন্তব্য করে কোনো লাভ হবে বলে মনে হয় না।

২. বেসরকারি বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য অর্থ উপার্জন। তারা নিছক মুনাফার জন্য এইসব প্রতিষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছে। এদেশে শিক্ষা হয়ে উঠেছে একটি বড়োসড়ো বাণিজ্য ও আর্থিক কর্মকাণ্ড। সেই শিক্ষায় মূল্যবোধ নৈতিকতার কোনো স্থান নেই— বহু ক্ষেত্রেই গাধা পিটিয়ে মানুষ করার উদ্দেশ্য এদের থাকে না। এরা শিশুদের ইংরেজি ভাষা, কেতা আর কর্পোরেট জগতে কেউকেটা হবার তালিম দিতে চায়। অভিভাবকরাও সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাধ্যাতীত অর্থব্যয় করে পরের প্রজন্মকে বড় চাকুরে, বড় আমলা, প্রযুক্তিবিদ বা চিকিৎসক করার লক্ষ্যে পরিচালিত করতে চান। এক ঘোর সামাজিক অবক্ষয় আর অর্থসচেতন বিনিময় সম্পর্কে যান্ত্রিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি চলছে।

৩. বিদ্যালয়গুলি কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে। ছোট ছোট দ্বীপের মতো— এর মধ্যে আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক বাতাবরণ রচিত হয়। আমাদের ব্রিটিশ শাসনের পরের অনিবার্য পরিণতিতে এই আন্তর্জাতিকতা ইংরেজি ভাষা বাহিত। দেশি শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত খরিদ্দারদের শ্রদ্ধা নেই। তারা কিছু এসেছেন কর্পোরেট জগৎ থেকে, কেউ কেউ সেই জগৎটিকেই কাঙ্ক্ষিত স্বর্গ ভাবেন। ফলে দেশ-সমাজ-পরিবার আর বৃহৎ জগৎ সম্পর্কে এই ইগলু-বন্দি শিক্ষার্থীদের কিছুমাত্র প্রীতি নেই, আসক্তি নেই। তারা জানে তারা পিতামাতার ইচ্ছাপূরণের রোবট-ধরনের অস্তিত্বহীন অনুভূতিহীন হুকুম তালিম করার যন্ত্র। তাদের কাজ ক্লাস পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর বা গ্রেড লাভ— গান, নাচ, আঁকা, কুংফু, কুস্তি, সাঁতার সব ক্ষেত্রে সবার আগে থাকতে হবে তাদের। এই চাপ তাদের বিচ্ছিন্ন, নির্জন, বিমর্ষ, একলা, কখনো কখনো আক্রমণাত্মক আত্মহননশীল করে তুলছে কিনা সে কথা ভেবে দেখছি না আমরা।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আরও জঘন্য। এখানে সব রক্ত মুখে উঠে আসার মতো অবস্থা হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই খ্রিস্টিয় মিশন পরিচালিত। বিগত বাম সরকার হঠাৎ

'মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ' বলে হুঙ্কার দিয়ে সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি পড়ানো বন্ধ করে দিলে সমস্ত রাজ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। সাধারণ মানুষ তো বটেই, আচার্য সুকুমার সেন- অধ্যাপক নীহার রঞ্জন রায় থেকে আরম্ভ করে বহু পণ্ডিত-সাহিত্যিক এই অন্যায় ব্যবস্থার প্রতিবাদে পথে নামেন। সেদিন স্বৈরতান্ত্রিক বামপন্থীরা এই প্রতিবাদকে কানে তোলেনি। ফলে বাংলার সর্বত্র সরকারি শিক্ষার উপর সাধারণ অভিভাবকদের বিশ্বাস উবে গেল। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান তত্ত্বগতভাবে শতকরা শতভাগ ঠিক ছিল। থিওরিটিক্যালি কারেক্ট হওয়া সত্ত্বেও প্র্যাক্‌টিক্যালি এটি সম্পূর্ণ ইনকারেক্ট হলো। বাংলায় সেদিন ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল ছিল কম, শহর কলকাতা ছাড়া অন্যত্র ভালো মতো পরিচালিত বিদ্যা প্রতিষ্ঠান তেমন ছিল না। বাম সরকারের অপ্রস্তুত স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তে বাংলার শিক্ষা আড়াআড়ি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। একদিকে থাকল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি— দরিদ্র অপুষ্টিতে জীর্ণ ক্ষুধার্ত প্রথম প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীরা— শিক্ষক সংখ্যায় অতিশয় স্বল্প। ভাঙাচোরা ঘরে টিনের ফুটো চালাঘরে চলতে থাকল। কিছু শিক্ষক ছিলেন সরকারের দলীয় সদস্য। চাকরি পেতেন দলীয় আনুগত্যের কারণে। অন্যদিকে 'সেন্ট'-নামাঙ্কিত জাল-মিশন স্কুলে ভরে গেল রাজ্য। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি এই আশ্চর্য আগ্রহের ফলে সরকারি শিক্ষা মুখ থুবড়ে পড়ল। বেসরকারি শিক্ষাও ব্যবসা করল, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা উন্নতি দায়িত্বপালন করার কথা তাদের ভাবতে বয়ে গেছে। স্কুলের মামলাবাজ একজন প্রধান শিক্ষককে জানি যিনি কয়েকবার ব্রিটিশ কাউন্সিলে ইংরেজি শিক্ষণের তালিম নিয়ে ব্যাকরণ বই লিখে প্রকাশকদের নয়নের মণি হয়ে উঠে জনপ্রিয় হয়ে 'নেসলে'র গ্রামারকেই হারিয়ে দিলেন! বাম সরকারের পতনের অন্যতম কারণ শিক্ষাক্ষেত্রে এই ভয়ঙ্কর তালেবরদের প্রতিষ্ঠার সুযোগ ঘটানো। ফলে রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে বাণিজ্যকরণ সম্পূর্ণ হলো। দলতন্ত্র, বেলাগাম আধিপত্য উচ্চ শিক্ষাকে মারল ডগায়— ইংরেজি তুলে দেবার ফলে শিক্ষা মরল গোড়ায়।

নতুন সরকার গড়ে উঠল একই ভাবকাঠামোর উপর। আগে তাও একটু রাখঢাক ছিল। এখন তাও নেই। শিক্ষক নিয়োগ কেন্দ্রগুলি হয়ে উঠল দলীয় আনুগত্য প্রকাশের এবং অনুগতদের পুরস্কৃত করার ক্ষেত্র। দীর্ঘদিন ধরে সরকারি বিদ্যালয়ে কাউকে নিয়োগ করা হয়েছে কিনা— যে নিয়োগে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি, এমন হয়েছে কিনা বলা যায় না।

এই অবস্থায় কলকাতা (আর বড়জোর কয়েকটি পুরোন শহরাঞ্চলের চিরাচরিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)-র কিছু অঙ্গুলিমেয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি তীব্র আগ্রহ জন্মেছে। অভিভাবকরা সাধ্যাতীত অর্থে সন্তানদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য কৃত্রিম প্যাকেজ খরিদ করছেন। প্রতিষ্ঠানগুলিও আদর্শচ্যুত হয়ে নিছক অর্থ সচেতন হয়ে উঠছে।

এ লেখার শুরুতে লেখা সমস্যাগুলির আসল কারণ এই পটভূমিতেই সন্ধান করতে হবে। শান্তভাবে আত্মশক্তি, বিবেচনাবোধ আর নিরাসক্তদৃষ্টির সাহায্যে দলীয় কৌশল বাদ দিয়ে ভোটের অঙ্ক না করে এর সন্ধান করতে পারলে আমরা হয়তো পরিত্রাণ পাবো। অপ্রস্তুত অর্ধশিক্ষিতের ভিড়ে পথসভা করা হাততালি-প্রিয় রাজনীতি এই সন্ধানের অবকাশ দেবে বলে আশা করতে পারছি না। বাংলা এক সময় ছিল শিক্ষা, বিজ্ঞান গবেষণা, শিল্প, সাহিত্যে প্রথম সারিতে। এখন শিক্ষায় নৈরাজ্য, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ম্লেচ্ছাচার (যা বাম স্বৈরাচারের চেয়েও ভয়ঙ্কর কারণ তা অপরিণামদর্শী চাটুপ্রিয় আর স্বভাবত অশিক্ষিত), শিক্ষার সামগ্রিক মানে নিম্নগামী আমাদের রাজ্য খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে। বিচ্ছিন্ন ভাবে বিচার করলে, ছোটখাটো সিদ্ধান্ত নিয়ে তাৎক্ষণিক হাতেগরম সমাধান খুঁজে জীর্ণ বস্ত্রটিতে তাপ্পি মেরে রিফু কর্ম করে কোনো স্থায়ী পরিত্রাণ মিলবে না।

শিক্ষাকে ভারতীয় সমাজ-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করতে হবেই। স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন, 'আমাদের সমাজে বিদ্যা বিক্রয়যোগ্যপণ্য ছিল না'— আমাদের সেই পরিবেশে ফিরিয়ে নিতে হবে। কাজটি কঠিন, তবে অসম্ভব নয়। আর চাই, শিক্ষাকে চাকরি থেকে বিচ্ছিন্ন করা। কাজটি কঠিন। বিশেষত আমাদের সমাজে শ্রম- ব্যবসাবাণিজ্য-শিল্পোদ্যোগ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি না বদলালে শিক্ষাবিক্রির কেন্দ্রগুলির অহঙ্কার-দুর্ব্যবহার-অব্যবস্থা-দুর্নীতি- প্রচলিত ব্যবস্থায় স্থানীয় রাজনৈতিক পাণ্ডা-গুণ্ডা আর ধাপ্পার সঙ্গে গোপন সমঝোতা থেকেই যাবে। জি.ডি. বিড়লা বিদ্যালয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন গড়ে ওঠা আর সেখানকার প্রধান শিক্ষিকার পদত্যাগ, ওই দুই অভিযুক্ত শিক্ষকের সাময়িক গ্রেপ্তারির পর অভিভাবকদের সংগঠনে আত্মদ্বন্দ্বের আভাস সেদিকেই ইঙ্গিত করছে না কি? শিক্ষা সম্পর্কে একটি গভীর অন্তর্দৃষ্টি, সন্ধান আর নিরপেক্ষ বিবেচনা পশ্চিমবঙ্গের আগামী প্রজন্মের জন্য দরকার। তবে মূর্খ দুর্বৃত্তের শাসনে এই দাবি তোলা হয়তো চক্রান্ত বলে গণ্য হবে। তবু, কথাটি কাউকে না কাউকে তো বলতেই হবে।

(লেখক গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য)

জি. ডি. বিড়লা কাণ্ড কার নিন্দা করো তুমি ভাই?

ড. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ জুড়ে পশ্চিমবাংলার মিডিয়া ও সংবাদপত্রে জি. ডি. বিড়লা স্কুলের বেদনাদায়ক ঘটনা নিয়ে তুমুল হৈচৈ দেখলাম। দক্ষিণ কলকাতার জি. ডি. বিড়লা স্কুলে ৩০ নভেম্বর চারবছরের এক শিশুকন্যার উপর যৌন নির্যাতনের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আলোড়ন সৃষ্টি হয়। স্পষ্টই প্রমাণিত হলো বিশাল অঙ্কের ফি নেওয়া এই স্কুলে সঠিক নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা নেই। আরও মর্মান্তিক হলো স্কুলে পি.টি. শিক্ষক এই কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। ১ ডিসেম্বর ছাত্রীদের নিরাপত্তা ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে যাদবপুর থানায় বিক্ষোভ দেখানো হলো। তারপর আন্দোলনের রাশ চলে যায় অভিভাবকদের হাতে। আন্দোলন নিরাপত্তার দাবিকে কেন্দ্র করে শুরু হলেও প্রিন্সিপাল শর্মিষ্ঠা নাথ হয়ে উঠলেন রোষের অভিমুখ। তাঁকে শোকজ করা হলো এবং বিদ্যালয় থেকে দীর্ঘ ছুটিতে পাঠানো হলো। জয়লাভের যুক্তি দেখিয়ে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়। এরপর প্রথমে উঁচু শ্রেণীতে তারপর নীচু শ্রেণীতে পঠন-পাঠন শুরু হলো।

উপরের ঘটনা থেকে দুটি বিষয় জানা গেল। একটি হলো শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতি আর অন্যটি হলো নারী নির্যাতন, তা বয়স্কাই হোক আর নাবালিকা শিশুই হোক না কেন। এই দুটি বিষয় আলোচনা করার আগে ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে একটু নজর দেওয়া প্রয়োজন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর ভারতে গণতান্ত্রিক শাসন বলবৎ হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা ও মূল ধারাগুলি প্রয়োগ করার অঙ্গীকার নিয়ে কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় বসেন। অথচ দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রেই সংবিধানের মর্যাদা লঙ্ঘিত হচ্ছে। আর ন্যায়বিচার ও জনকল্যাণের জন্য হরেকরকম আইন চালু হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি, সংস্কৃতি, আইন শৃঙ্খলা সব ক্ষেত্রেই এত অধঃপতন, বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তা কেন? আসলে তত্ত্ব ও প্রয়োগ এই দুইয়ের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই। অনেক ক্ষেত্রে রক্ষকই ভক্ষকে রূপান্তরিত হন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও সামাজিক ক্ষেত্রে সমভাবে এই চিত্র চোখে পড়ে। যারা কুকর্ম করে ও সমাজবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত তাদের আড়াল করার জন্য কুনাট্যের অভিনয় হয়। এমনকী পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা চোখে পড়ার মতো। খোদ শহর কলকাতার বুকে জি. ডি. বিড়লা স্কুলের ঘটনা নিয়ে তোলপাড় হলেও পশ্চিমবাংলার গ্রামেগঞ্জে অসংখ্য কুকীর্তিতে মগ্ন ব্যক্তিরা সহজেই ছাড়া পেয়ে যান।

> নিষ্পাপ আতঙ্কিত মুখগুলো তাদের প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে, কিন্তু কে দেবে তাদের উত্তর।

এসব কুকর্মের মধ্যেই পড়ে নারী নির্যাতনের বিষয়টি। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো (এন সি আর বি) প্রদত্ত রিপোর্ট অনুসারে ভারতে প্রতিদিন ৯৩ জন নারী ধর্ষিত হন অর্থাৎ গড়ে প্রতি পনেরো মিনিটে একটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। নথিভুক্ত ধর্ষণের ঘটনার পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ২০১২ সালে ২৪৯২৩, ২০১৩ সালে ৩৩৭০৭টি আর ২০১৪ সালে ৩৭০০০ ধর্ষণের সংখ্যা ছিল। নথিভুক্ত নয় এমন ধর্ষণের সংখ্যা

অনেক বেশি। প্রায় ৫৪ শতাংশ ধর্ষণের ঘটনা জনসমক্ষে আসে না। আর এইসব ধর্ষণের শিকার হয় ২/৩ বছরের শিশু থেকে ৭০/৮০ বছরের বৃদ্ধা।

নারী নির্যাতনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সামাজিক মূল্যবোধের অভাব। নানান ধরনের নেশাজাত দ্রব্যের বিপুল ব্যবহার। বেআইনি মদ বিক্রয় করার প্রতিবাদ করতে গিয়ে খুন-ধর্ষণের কাণ্ড ঘটে। বিদেশি চোরাকারবারিরা মাদকদ্রব্য পাচার, গোরু পাচার ও জালনোটের কারবারে লিপ্ত। মালদহের কালিয়াচকের ঘটনা এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আরও মজার কথা হলো, ছেলে-মেয়েদের আচার আচরণে পোস্ট মর্ডানিজমের প্রভাব। ছেলে-মেয়েরা সামাজিক অনুশাসনের কথা ভুলে গিয়ে নিজেদের মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। উদ্দাম নৃত্য, অশালীন বেশভূষা, অবাধ নারী-পুরুষ সম্পর্ক এসব নাকি প্রগতিশীলতার লক্ষণ। অতি-বাম মতাদর্শে বিশ্বাসী ছাত্রসমাজ এরকম অবাধ স্বাধীনতার পক্ষপাতী। ভাবতে পারেন শ্রেণীসংগ্রামের মতাদর্শ কোন তলানিতে গিয়ে পৌঁছেছে।

সাম্প্রতিক গুজরাট নির্বাচনে প্রচারের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যথার্থই বলেছেন বিকাশ প্রয়োজন। বিনাশ নয়। আর্থিক বিনাশ, সামাজিক অবক্ষয়, দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অবমাননা এসবের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে হলে চাই বিকাশ ও শান্তি। জাতিবর্ণের সংঘাত নয়, চাই সহাবস্থান। অশুভ ধর্ষণ কাণ্ড থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে সুষ্ঠু বিকাশের পথে এগোতে হবে।

জি. ডি. বিড়লা শিক্ষায়তনের মর্মান্তিক ঘটনায় পশ্চিমবাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল অবস্থার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয় জীবনের বিকাশে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছিলেন। তিনি মনে করতেন একমাত্র শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমেই ভারতের সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। তাঁর শিক্ষাচিন্তায় মানুষের প্রকৃত বিকাশ শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব (man making education)। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষার প্রসার ঘটানো প্রয়োজন। স্বাধীন ভারতে শিক্ষায়তনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু শিক্ষার উৎকর্ষের দিকে তেমন নজর দেওয়া হয়নি। এছাড়া সরকারি স্কুল কলেজে শিক্ষার মান ক্রমশ হ্রাস পাওয়ায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আসর জমিয়ে বসেছে। এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিপুল অর্থের বিনিময়ে শিক্ষার সুযোগ মেলে। আশ্চর্যের কথা, সর্বজনীন শিক্ষা সরকারের ঘোষিত নীতি হলেও বিগত দু'দশকে এ রাজ্যের সর্বস্তরে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির রমরমা অবস্থা। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও একই হাল। বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলি ফুলে ফেঁপে উঠছে। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে, সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যে মনোভাব নিয়েছে, তাতে আমজনতা নিম্নমানের পরিষেবা পায়। তাইতো দেখি জি. ডি. বিড়লা স্কুলের মতো প্রতিষ্ঠানের কদর বেশি। আশ্চর্য লাগে এসব প্রতিষ্ঠানেও নিরাপত্তার বাঁধন কতটা দুর্বল!

অধুনা বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মতো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর সরকার নজরদারির চেষ্টা করছে। কিন্তু কেউ ভাবছেন না, কেন সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে মানুষ মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে? তাই সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির উৎকর্ষের দিকে নজর দিতে হবে। কিন্তু এই পথে প্রধান বাধা হলো সুস্থ পরিবেশের অভাব। গর্ভনিং বডি বা পরিচালক সমিতি নিয়ন্ত্রণ করে শাসকদলের নেতা-নেত্রীরা। কলেজগুলিতে ছাত্র ও কর্মচারী সমিতির হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ কায়েমের প্রচেষ্টা। চোখ খুললেই দেখা যায় গৌড় বঙ্গ, রায়গঞ্জ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শাসকশ্রেণীর ছাত্র সংগঠনগুলি কীরকম অপকর্ম করে চলেছে। শাসকপক্ষের অনুগামী হওয়া সত্ত্বেও গৌড়বঙ্গের উপাচার্য পদত্যাগ করেছেন। শিক্ষাঙ্গণে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশের পাশাপাশি চলছে প্রশাসনিক শৈথিল্য। বিগত বামফ্রন্টের আমল থেকেই এই প্রবণতা প্রকট হয়ে উঠেছে। শিক্ষাবিদ ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরাও নীরব দর্শকের ভূমিকায়। শিক্ষালয়ের স্বাধিকার শিক্ষায় উৎকর্ষের একমাত্র পথ। এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক দূষণের প্রতিকার। এলাকার রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের সঠিক সংঘাত আচরণ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সদিচ্ছা ও সুদৃঢ় আইনের শাসন।

অভিযুক্ত মহম্মদ মফিজুল ও অভিষেক রায়

প্রিন্সিপাল শর্মিষ্ঠা নাথ

> "প্রিন্সিপালের আচরণ আরও বেশি মানবিক, আরও বেশি সহমর্মী হওয়া উচিত ছিল না কি?"

জি. ডি. বিড়লার মর্মান্তিক কাণ্ডের সুযোগ নিয়ে কে বা কারা ঘোলাজলে মাছ ধরতে চাইছেন সেদিকটিও নজরে রাখা প্রয়োজন। জাগ্রত জনমত পরিত্রাণের একমাত্র পথ। নারী নির্যাতনের সূত্র ধরে উত্তাল আন্দোলন হলো সত্য। কিন্তু পরিচালক সমিতি যদি সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকতো তাহলে আন্দোলনের পদ্ধতি কেমন হতো সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। অভিভাবকরা কি কোনো ধরনের দলীয় রাজনীতির সংক্রমণ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারবেন? তাঁরা কি কোনো রিমোট কন্ট্রোলের বৃত্তের বাইরে থাকতে পারবেন?

(লেখক পশ্চিমবঙ্গ আর্কাইভ-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর)

এই সময়

মৃত্যুশীতল

নদীর জল বেশিরভাগ জায়গায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় এক প্রৌঢ়া

কোনওভাবে নদীতে পড়ে যান। মৃত্যু অনিবার্য ছিল। কিন্তু চুয়ান্ন বছরের শি লেই এবং তার সঙ্গী সময়মতো নদীতে ঝাঁপিয়ে উদ্ধার করেন মহিলাকে। ঘটনাটি উত্তর চীনের হেবেই প্রদেশের।

বরফপ্রপাত

বাড়িটি পরিত্যক্ত। সেই বাড়িরই পাইপ লিক করে জল পড়ছিল। কিন্তু এত ঠাণ্ডা যে জল

মাটিতে পৌঁছবার আগেই বরফ! ঘটনাটি চীনের লায়াওনিং প্রদেশের। জানা গেছে, বাড়িটির পাইপে লিকেজ হয়েছে অক্টোবরে। কিন্তু বরফ হওয়ার আগে পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারেনি।

আটানব্বইয়ে স্নাতকোত্তর

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বাদশ বার্ষিক সমাবর্তনে একজন ৯৮ বছর বয়েসি ছাত্রকে স্নাতকোত্তর

ডিগ্রি দেওয়া হলো। শতবর্ষ ছুঁই ছুঁই রাজকুমার ভইশের হাতে মানপত্র তুলে দেন মেঘালয়ের রাজ্যপাল গঙ্গাপ্রসাদ। রাজকুমারবাবু অর্থনীতিতে এম.এ পাশ করেছেন।

সমাবেশ -সমাচার

সংস্কার ভারতীর প্রাদেশিক শিল্পী সম্মেলন

গত ১৬, ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক শিল্পী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বীরভূম জেলার সিউড়ী শহরের সরোজিনী দেবী সরস্বতী শিশু মন্দিরে। সম্মেলনের পরতে পরতে ছিল রাঙামাটির ছোঁয়া— বিলুপ্তপ্রায় পটের গান থেকে ভাদু গান, লোকগান থেকে বাউল। পট শিল্পী লালটু চিত্রকর রামায়ণ মহাভারত-সহ পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে পট চিত্রের সঙ্গে গান গেয়ে মুগ্ধ করেন সকলকে। ভাদু গান শোনান বিশিষ্ট ভাদু শিল্পী রতন কাহার। এছাড়া বাউল গান শোনান শিল্পী লক্ষ্মণ দাস বৈরাগ্য। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের বৈচিত্র্য নিয়ে সংস্কার ভারতীর বিভিন্ন শাখা তাদের নিজস্ব এলাকার ঐতিহ্য উপস্থাপন করে সম্মেলন মঞ্চে। নবদ্বীপ শাখার কীর্তন, পুরুলিয়ার ছৌ, হাওড়ার বিভিন্ন শাখা লোকনৃত্য ও সৃজনশীল নৃত্য উপস্থাপন করে মুনশিয়ানার পরিচয় দেয়। দুই চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন শাখার সঙ্গীত আলেখ্য যেমন নজর কাড়ে তেমনই কলকাতার বিভিন্ন শাখা তাদের সমবেত গানে পেশাদারি যোগ্যতার প্রমাণ দেয়। মেদিনীপুরের বিভিন্ন শাখা ভাটিয়ালি গান পরিবেশন করে। নদীয়ার বহু শাখা তাৎক্ষণিক মঞ্চায়নের মাধ্যমে চিত্রাঙ্কনে মুনশিয়ানা দেখায়। হুগলী জেলার শাখাগুলি সৃজনশীল নৃত্যের পাশাপাশি বাংলার আদি নৃত্যের ধারা গৌড়ীয় নৃত্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন

করে। প্রভু নিত্যানন্দ নামাঙ্কিত সম্মেলন স্থলে দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলা থেকে সাড়ে তিনশো শিল্পী একত্রিত হন। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সংস্কার ভারতীর সর্ব ভারতীয় সহ-সংগঠন সম্পাদক আমীরচাঁদ। সরস্বতী প্রতিমায় পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন লোকসম্রাজ্ঞী স্বপ্না চক্রবর্তী। সম্মেলনে আমীরচাঁদ বলেন, দেশের সর্ববৃহৎ সাংস্কৃতিক সংগঠন সংস্কার ভারতী দেশ জুড়ে ভারতের সনাতন সংস্কৃতি রক্ষায় বদ্ধ পরিকর। অতিথিদের বরণ করা হয় বীরভূমের ভূমিপুত্র বনবাসী বোনদের বরণরীতি মেনে। একই সঙ্গে বনবাসীদের হাতে তৈরি শাল পাতা দিয়ে তৈরি মুকুট পরিয়ে স্বাগত জানান সিউড়ীর শিল্পীরা। সম্মেলনে বিভিন্ন শাখার শিল্পীদের ভাস্কর্য, চিত্রকলা, গ্রাফিক্স-সহ নানা সামগ্রী দিয়ে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। মা তারা নামাঙ্কিত চিত্র প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তিনজন বিশিষ্ট শিল্পী সারথি দাস, পিন্টু কর্মকার, দুলাল দাস।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আন্তঃশাখা সমবেত 'নৃত্য নির্মিতি' সম্মেলনে এক নতুন সৃজন কর্ম উপস্থাপিত করে। নৃত্যের মূল্যায়ন করেন শিল্পী শিপ্রা মুখোপাধ্যায় ও সুচেতা লাহিড়ী। বিভিন্ন শাখা কালজয়ী নানা ছড়ার গান পরিবেশন করে শ্রোতাদের স্মৃতিমেদুর করে তোলে। গানের মূল্যায়ন করেন শিল্পী শান্তব্রত নন্দন। বিকেলে আগত শিল্পী প্রতিনিধিরা সিউড়ী শহরে 'সাংস্কৃতিক চেতনা পদযাত্রা'য় শামিল হয়। শহরের নানা পথ ঘুরে বাংলা সংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিক উপস্থাপন করেন শিল্পীরা। বনবাসী নৃত্য, বৃন্দ গান, দাসাই নৃত্য, শঙ্খবাদন, ট্যাবলো করে সুদৃশ্য শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। সান্ধ্যকালীন প্রকাশ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট অভিনেতা তপন গাঙ্গুলী। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত। সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে শিশু কিশোর বিভাগ তাদের প্রতিদিনের জীবনের অসুবিধা ওপর একটি নাটিকা

এই সময়

সুষমার পাক-নিন্দা

কুলভূষণ যাদবের স্ত্রী ও মায়ের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করার জন্য বিদেশমন্ত্রী

সুষমা স্বরাজ তীব্র ভাষায় পাকিস্তানের নিন্দা করেছেন। পাকিস্তানের অমানবিক আচরণ এবং গোটা ঘটনাটিকে সারা বিশ্বের কাছে প্রোপাগান্ডা হিসেবে তুলে ধরার জন্য তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

ক্ষেপণাস্ত্রপ্রযুক্তি

ভারত সফলভাবে বহুস্তরীয় ব্যালিস্টিক মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম উৎক্ষেপণ করল।

এই সিস্টেম প্রকৃতপক্ষে একটি পরিপূর্ণ ক্ষেপণাস্ত্র। অ্যাডভান্সড এরিয়া ডিফেন্স (অ্যাড) ইন্টারসেপ্টার মিসাইলটি উৎক্ষেপণ করা হয়েছে ওড়িশার কালাম দ্বীপ থেকে।

অখিতে নিখোঁজ

প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মলা সীতারমন সংসদে জানিয়েছেন অখির তাণ্ডবে নিখোঁজ ৬৬১ জন

ধীবরের এখনও সন্ধান মেলেনি। এদের মধ্যে ৪০০ জন তামিলনাড়ুর এবং ২৬১ জন কেরলের। উল্লেখ্য, ভারতীয় নৌসেনা ৮২১ জন ধীবরকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রস্তুত করে। এছাড়াও বিভিন্ন শাখা নানা বিবিধ আঙ্গিকের অনুষ্ঠান পরিবেশন করে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। সম্মেলনে মঞ্চ সজ্জায় শিল্পী যামিনী রায়ের শিল্প কর্ম, বাংলা ঐতিহ্যবাহী সামগ্রী কুলো, শেরপাই, সরা, খোডাই, মাদুর, চাটাইয়ের মতো নানা জিনিসের সুন্দর ব্যবহার সকলের নজর কেড়েছে। সম্মেলনকে প্লাস্টিক মুক্ত রাখার জন্য থারমোকলের ব্যবহার বর্জন করার উদ্যোগ নিয়েছে উদ্যোক্তারা। সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক ভরত কুণ্ডু-সহ দক্ষিণ বাংলার তিনশতাধিক শিল্পী অংশগ্রহণ করেন।

ঝাড়গ্রামে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ঝাড়গ্রাম জেলার বহড়াকোঠা বি. বি. মাল্টিপারপাস স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল গত ১৭ই ডিসেম্বর। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে মোট ১১৫ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। উপস্থিত অভিভাবকদের জন্যও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক

অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিযোগিতা শেষে সফল প্রতিযোগিদের পুরস্কার বিতরণ ও বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থিত অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমাজসেবী ও স্কুলের সম্পাদক তপন কুমার মাহাত বলেন, জঙ্গলমহল অঞ্চলের এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তার দায়িত্ব সর্বদা সচেতনভাবে পালন করতে অঙ্গিকারবদ্ধ।

সীমা জাগরণ মঞ্চের নদীয়া জেলা সম্মেলন

সীমা জাগরণ মঞ্চের নদীয়া জেলা সম্মেলন গত ২৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় কৃষ্ণনগর এভি হাইস্কুলের ব্রজনাথ সভাগারে। সম্মেলনে ৭৪টি গ্রাম থেকে ২৫ জন পুরুষ ও ৩৫

জন মহিলা-সহ মোট ১৬০ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ-এর বর্তমান ৯৯ ব্যাটেলিয়ান কমান্ডার পি.কে. দুবে এবং ডেপুটি কমান্ডার

এই সময়

বামে নাখুশ

সিপিএমের অপশাসনে তিতিবিরক্ত মানুষের বৃহত্তম সমাবেশের সাক্ষী হয়ে থাকল ত্রিপুরা।

৬০টি নির্বাচনী ক্ষেত্র থেকে আসা ২ লক্ষেরও বেশি মানুষ সমবেত হয়েছিলেন এক প্রতিবাদ-সমাবেশে। এই সমাবেশ ছিল বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার অঙ্গ।

অতিথি দেব ভবঃ

গোয়ায় যাঁরা থাকেন তাঁরা পর্যটকদের

নিকটাত্মীয় হিসেবেই গ্রহণ করে থাকেন। এই আন্তরিকতার প্রমাণ পাওয়া গেল সম্প্রতি রাজ্য সরকারের একটি সিদ্ধান্তে। এবার থেকে পর্যটকদের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেবে সরকার।

অস্ত্র উদ্ধার

সেনা, সিআরপিএফ এবং পুলিশের মিলিত

উদ্যোগে জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়াসি জেলা থেকে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে অভিযান চালানো হয়। তারপর রিয়াসির শেরগাড়ি অঞ্চলে মাটি খুঁড়ে বের করা হয় এই অস্ত্রভাণ্ডার।

সমাবেশ -সমাচার

ইউ.এস. রাঠোর। ভারত বাংলাদেশ বর্ডার নিয়ে আলোচনা করেন সীমা জাগরণের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক জগন্নাথ সেনাপতি। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের নদীয়া জেলা সভাপতি শৈলেন বিশ্বাস। গত ১ ডিসেম্বর পূর্বমেদিনীপুর জেলা কার্যকর্তাদের প্রশিক্ষণবর্গ হলদিয়া নগরে হলদিয়া ডকের ইউথ ক্লাবের হলঘরে অনুষ্ঠিত হয়। কার্যকর্তাদের দিশা নির্দেশ করেন সীমা জাগরণের অখিল ভারতীয় সহ-সংযোজক প্রদীপজী ও প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক জগন্নাথ সেনাপতি। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক কল্যাণ সৌন্দ। বর্গে ১৩টি ব্লক থেকে ৪১ জন কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

পুরুলিয়ায় সংস্কৃত সম্মেলন

গত ১৭ নভেম্বর সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে পুরুলিয়া শহরে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে এক সংস্কৃত সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনের শুরুতে ছিল এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। ২৪০ জন সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তি ও ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। ১০০ জন মহাবিদ্যালয় ও

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। শহর পরিক্রমার পর সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনে প্রধানবক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতভারতীর অখিল ভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ ড. পি. নন্দকুমার। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন বর্ডার লাইন দি পত্রিকার সম্পাদক শ্যামল কিশোর তেওয়ারী, বিশিষ্ট লেখক তথা বিদ্যাসাগর ফাউন্ডেশনের অধ্যক্ষ স্বপন সেন, বিশিষ্ট আইনজীবী অমিতাভ মণ্ডল, সিধু-কানু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আজব কুমার মিশ্র, পূজ্য স্বামী আধেয়ানন্দ মহারাজ প্রমুখ। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন পুরুলিয়া জে.কে. কলেজের সংস্কৃতের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক রাজেন্দ্রপ্রসাদ দাস।

দুর্গাপুরে সেবা বিভাগের কম্বল বিতরণ

গত ২০ ডিসেম্বর সেবা বিভাগের উদ্যোগে দুর্গাপুর (ইছাপুর) সেবা ভবনে দুঃস্থদের কম্বল দান করা হয়। দুর্গাপুরের প্রখ্যাত বিদ্যালয় গুরু তেগবাহাদুর স্কুলের পক্ষ থেকে কম্বল দান করেন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী সুতপা আচার্য ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা। সেবা সংস্থার পক্ষ থেকে সহ সম্পাদিকা শ্রীমতী কাকলি চ্যাটার্জী ও সহ-সম্পাদক শ্যামাপদ মণ্ডল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ৩৫ জন বনবাসী সমাজের মানুষের হাতে কম্বল দেওয়া হয়। সঙ্ঘের প্রান্ত সেবা প্রমুখ মনোজ চট্টোপাধ্যায় এবং জেলা সহ বৌদ্ধিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, দুর্গাপুরে ২টি নামি স্কুল ডি.এ.ভি মডেল এবং গুরু তেগবাহাদুর স্কুল বিভিন্ন ভাবে সেবাকাজে সহযোগিতা করে চলেছে।

নির্বাচন জেতা একটি শিল্পকর্মের মর্যাদা দাবি করে

অতিথি কলম

রাম মাধব

প্রধানমন্ত্রী মোদী ও অমিত শাহ প্রথম থেকেই জানতেন গুজরাট নির্বাচনের গুরুত্ব। আর তাই কখন, কোথায়, কাকে, কীভাবে কাজে লাগাতে হবে সেটাও ছিল তাঁদের জানার পরিধির অন্তর্গত। মূল বিষয় ছিল সঠিক সময়ে উপযুক্ত কৌশলের প্রয়োগ।

নির্বাচন জেতার ব্যাপারটা আজকাল একাধারে শিল্প ও বিজ্ঞানের দ্বৈত তকমা পাচ্ছে। এখনকার নির্বাচন অতীত দিনের মতো প্রচার চালানো, কিছুটা জাতপাত নিয়ে হৈ-হল্লা করা আর শেষমেশ নগদ টাকাকড়ি ছড়িয়ে কেল্লা ফতে করে দেওয়া নয়। একথা বলতে অবশ্য দ্বিধা নেই যে গ্রিক দার্শনিক হেরোডোটাসের সংজ্ঞা অনুযায়ী নির্বাচন বরাবরের মতো আজও সমষ্টিগত মানুষের ইচ্ছার প্রকাশ।

কিন্তু লোকের সম্মিলিত ইচ্ছার সঠিক হদিশ পাওয়া কিংবা তাঁদের ইচ্ছাকে সদর্থকভাবে পরিচালিত করার পদ্ধতি আমূল বদলে গেছে। এই কৃৎকৌশল একটি আয়ত্ত করার বস্তু যা আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও দলীয় সভাপতি অমিত শাহ সফল ভাবে আত্মস্থ করেছেন। রাজনীতি কোনো দানধ্যানের বিষয় তো নয়ই এটি কোনো অবসর সময় কাটানোর জন্যও নয়— যে যখন সুবিধে হলো তখন কিছুটা সময় কাটিয়ে গেলাম। রাজনীতি একটি কঠিন বৃত্তি যার জন্য দরকার পড়ে একনিষ্ঠ লক্ষ্য সাধনে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতা। রাজনীতির ক্ষেত্রে দলগুলির নিজেদের কর্মসূচি রূপায়ণ করতে গেলে ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসা একান্ত জরুরি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই নরেন্দ্র মোদী যখন দীর্ঘ সময় ধরে গুজরাট নির্বাচনের পেছনে লেগে থাকেন তখন তাঁকে সমালোচনা করা নিরর্থক।

এখানে পরিষ্কার বুঝে নেওয়া দরকার যে নির্বাচনের স্থান একদম প্রথমে। কেননা তাতে সফল হলে ক্ষমতা পাওয়া যায়। তবেই সুশাসন দেওয়া সম্ভব। এটি কখনই পেছন থেকে সামনে ঘোরানো যায় না। এই সূত্রে ক্ষমতাসীন দল যদি সুশাসন জারি রাখতে পারে, তার রাজ্য চালনায় যদি মানুষ কুশলতা দেখতে পায় তবেই নির্বাচনী সাফল্য আশা করা যায়। কেননা গণতন্ত্র তো শুধুই নির্বাচন নিয়ে নয়। গণতন্ত্রকে ঘিরে রয়েছে আরও বহু প্রতিষ্ঠান ও আনুষঙ্গিক আচার সংহিতা। সেই সবগুলির সমাহারেই গণতন্ত্র। নির্বাচন এই সামগ্রিক কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশমাত্র। কিন্তু সব চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হলো গণতন্ত্রের বাকি অংশগুলির কেউ নির্বাচিত নয়। কিন্তু নাশন্যাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের একটি সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক দলের ভোট প্রাপ্তির ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। এই এনজিটি কিন্তু একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা যা আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গীভূত। কিন্তু এটি নির্বাচিত সংস্থা নয়। সাম্প্রতিক গুজরাট নির্বাচনে আমাদের এর মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এঁদের একটি সিদ্ধান্ত যেটিকে পরিবেশ সংক্রান্ত দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিকই বলা যায়, তার পরিণতিতে আমরা একটা বড় সংখ্যক ভোট হারাই।

সাফল্যের সেই মহামন্ত্রের প্রসঙ্গে ফিরে বলতে হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও দলাধিনায়ক অমিত শাহের এর যথাযথ প্রয়োগ ও ফলশ্রুতি শতকরা ১০০ শতাংশ অধিগত ছিল। দিনের শেষে তাই ফলাফল ছিল প্রত্যাশিত। ইতিহাসের পাতায় সেই চতুর্থ শতাব্দী থেকেই গির্জার বিরুদ্ধে বহু বিদ্রোহ হতে দেখা গেছে। কিন্তু এই সমস্ত প্রতিবাদ প্রতিরোধকে সাফল্যের মুখ দেখতে ষোড়শ শতাব্দী অবধি অপেক্ষা করতে

> “সর্বাপেক্ষা বিয়োগান্তক হচ্ছে চর্তুদিকের এমন সম্মিলিত পরাজয় সত্ত্বেও কংগ্রেস তাদের হারকে জয় বা নিদেনপক্ষে একটা বিরাট পুনরুত্থান বলে চালাবার চেষ্টা করছে। বাস্তবে কংগ্রেস গুজরাটে ক্ষমতা হারিয়েছিল ১৯৯০ সালে। তারা পুরো ৩২ বছর ক্ষমতা থেকে দূরেই থেকে যাবে।”

হয়েছে। মার্টিন লুথার কিন্তু বিষয়গতভাবে নতুন কিছু করেননি, তিনি যেটা করেছিলেন তার পদ্ধতিটি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেই সময় সদ্য আবিষ্কৃত মুদ্রণযন্ত্রটির তিনি চূড়ান্ত ব্যবহার করেছিলেন। দেশে গেড়েবসা গির্জার সর্বময় প্রাধান্যের বিরুদ্ধে লেখা তাঁর পিএইচডি থিসিসটি তিনি যন্ত্রে বুদ্ধি করে ছাপিয়ে নেন। তারপর এর হাজার হাজার কপি বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেন। আর পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জনের ফলেই দেশ জুড়ে শুরু হয় বিক্ষোভ যার পরিণতিতে ১৫০ বছর ধরে চলে আসা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটে কাঙ্ক্ষিত সংস্কারে। আমরা গুজরাটে Sea plane চালিয়ে দেখাচ্ছিলাম আর কংগ্রেস ব্যস্ত ছিল গোরুর গাড়ির যুগের সমার্থক জাতপাতের রাজনীতি নিয়ে।

এখন আমরা তথ্য ও জ্ঞানের যুগে বাস করছি। দেশের মানুষ সর্বক্ষণ নানা খবরাখবর ও তথ্য খুব সহজে পেয়ে যাওয়ায় খুব তাড়াতাড়ি তথ্যগতভাবে শক্তিমান হয়ে উঠেছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়া এখন এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। প্রযুক্তি ও কৃৎকৌশল উভয়েই আজ এক বিশাল ভূমিকা পালন করছে। আর বিজেপি এই দু'টিকেই নিখুঁতভাবে ও পর্যাপ্তভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছিল। ভারতে এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় যুগান্তকারী পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ স্মার্ট ফোন আজ যোগাযোগের এক সমৃদ্ধ মাধ্যম। মূলধারার প্রচারমাধ্যমগুলি বিশেষ করে খবরের চ্যানেলগুলি লাফ দিয়ে বেড়েছে। এরা দেশের মানুষের জানার পরিধিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। ফলে চিরাচরিত কোনো নির্বাচনী কৌশল প্রয়োগ করে তাদের বাগে আনা যাবে না। এবারে বিরোধীদের একটা বড় সুযোগ ছিল। তারা অবশ্য চেষ্টার ত্রুটিও করেনি। কিছুদিন আগে আমি বলেছিলাম ভোটে আর মজা নেই, কেননা আসরে সেরকম কোনো বিরোধীই নেই। আমি অবশ্যই স্বীকার করব গুজরাট ব্যাপী এবারে বিরোধীরা তাদের উপস্থিতি টের পাইয়েছে। আর উপস্থিতির প্রতিক্রিয়া ছিল যথেষ্টই তীব্র যার জন্য নির্বাচনী যুদ্ধের উপযুক্ত সেরা সেরা সেনাপতিদেরই সমরাঙ্গনে পাঠানো হয়েছিল। পরিণতি কর্মানুগই হয়েছে। কিন্তু বিরোধীরা প্রথম দিন থেকেই তাদের খেই হারিয়ে ফেলল।

গুজরাটের মতো নির্বাচনে বাস্তবে প্রতিটি ভোট অমূল্য। আর যদি তোমাকে বিজেপির মতো এমন একটা সুসংবদ্ধ, কর্মঠ দলকে হারাতে হয় তাহলে যা কিছু যত কিছু আয়ুধ চারদিকে আছে তার প্রত্যেকটিকেই তোমায় কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু হায়! গুজরাটে কংগ্রেস নিজেকে একত্রিতই রাখতে পারল না। শঙ্কর সিংহ বাঘেলার দল ছেড়ে যাওয়াকে তারা অবলীলায় অবহেলা করল। জোটের পুরনো কিছু সঙ্গীকে ছেড়ে দিল। এমনকী তাদের চিরাচরিত ভোটব্যাঙ্ক সংখ্যালঘুদেরও অবহেলা করল। তারা নতুন করে আবিষ্কার করল এই একবিংশ শতাব্দীতে ক্ষমতার অলিন্দে যাওয়ার পথে কয়েকটি মন্দিরে ঢুঁ মেরে গেলেই কার্যসিদ্ধি হবে।

গুজরাট একটি পরম্পরা নির্ভর রাজ্য। এখানে রয়েছে দ্বারকা, স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায় বা সবরমতীর মতো স্থান। ইতিমধ্যে গত কয়েক দশকের ব্যবধানে গুজরাটবাসী তাদের মধ্যে বিবর্তনের পথ ধরে এর অত্যাধুনিক সমাজ গড়ে তুলেছে। এখানকার তরুণেরা শিক্ষিত, সঙ্গতিবান, প্রগতিশীল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন পরম্পরাকেও বিস্মৃত হয়নি। আজকের গুজরাট বিশ্বমানের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত নানা প্রতিষ্ঠান নিয়ে গর্ব করতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা গান্ধী থেকে সর্দার প্যাটেল হয়ে মোদীর মতো নেতারা উঠে এসে গুজরাটবাসীর মধ্যে এক শক্তপোক্ত জাতীয়তাবাদী মানসিকতার জন্ম দিয়েছে। এই ধরনের কোনো সমাজকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে গেলে সেই আবেদনের মধ্যে মার্জিত রুচি ও আধুনিকতার মিশ্রণ জরুরি। এসব ছেড়ে কংগ্রেস নেতারা গুজরাটের উন্নয়নকেই বিদ্রূপ করতে লাগলেন আর গৌরবান্বিত করে তুললেন বহুদিন জং ধরা জাতপাতের রাজনীতিকে।

হার্দিক জিগনেশ, মেওয়ানি, অল্পেশ ঠাকুর হয়তো তাদের প্রভাবের কিছু জায়গায় একটা সীমিত পরিমাণ ভোট জুটিয়েছেন কিন্তু কংগ্রেসকে গভীরভাবে আত্মচিন্তন করতে হবে যে গুজরাটব্যাপী তারা কত জায়গায় কত বড় সংখ্যায় ভোট হারিয়েছে। আর এটা তারা করেছে একটা সুসংহত গুজরাটি সমাজে ভাঙন আনার মতো বদমতলবে। আরও বেশ কিছু বিষয় যেমন মণিশঙ্কর আইয়ারের বিজাতীয় ঘৃণার উৎসার, হঠাৎ মনমোহন সিংহের মুখর হয়ে ওঠাও কংগ্রেসের পরাজয়ে যুগপৎ বড় ভূমিকা নিয়েছে।

কিন্তু এত কিছুর পরেই সর্বাপেক্ষা বিয়োগান্তক হচ্ছে চতুর্দিকের এমন সম্মিলিত পরাজয় সত্ত্বেও কংগ্রেস তাদের হারকে জয় বা নিদেনপক্ষে বিরাট পুনরুত্থান বলে চালাবার চেষ্টা করছে। কংগ্রেস গুজরাটে ক্ষমতা হারিয়ে ছিল ১৯৯০ সালে। বাস্তবে তারা পুরো ৩২ বছর ক্ষমতা থেকে দূরেই থেকে যাবে। তবুও ২৭ বছর পরেও ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে তাদের অক্ষমতা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একটি মিথ্যে চিত্ততুষ্টি ক্রিয়াশীল হয়ে উঠছে। আর বিজেপির জন্যও নীতিকথা রয়েছে— নির্বাচন একা আসে না তারা একটি প্যাকেজ হিসেবে আসে। সুশাসন, যথার্থ বিনয়ের মনোভাব, দলীয় একতা, তৃণমূল স্তরে দলের বাঁধন ধরে রাখা এগুলি সবই এই প্যাকেজের অংশ। জনতা গোটা প্যাকেজ-ভিত্তিক বিচার করে।

তবে, ভাগ্য-সহায়তায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। ■

পদ্মাবতী

'পদ্মাবতী' একটি ছায়াছবি মাত্র। অথচ সম্প্রতি সেই ছায়াছাবিটিই ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে তোলপাড় করে তুলেছে। এদেশের অধিকাংশ জনতার বিশ্বাস, 'পদ্মাবতী'র কাহিনিতে ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে। মেবারের মহারানা রতন সিংহের পরমাসুন্দরী স্ত্রী মহারানি পদ্মিনীর সঙ্গে দিল্লি-সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজির প্রেমের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে--- যা ঐতিহাসিকভাবে অসত্য। এই কথা ফাঁস হতেই উত্তর-পশ্চিম ভারত জুড়ে হিন্দুদের বিশেষত রাজপুতদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে অসন্তোষ। তারা ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভে পড়েছে ফেটে। আর সেই বিক্ষোভের ঢেউ আছড়ে পড়েছে ক্রমে অবশিষ্ট ভারতে।

কথায় বলে না, 'অতি চালাকের গলায় দড়ি।' 'পদ্মাবতী'র নির্মাতাদেরও এখন সেই দশা। তাঁরা ভেবেছিলেন, কোনোক্রমে ছবিটি নির্মাণ করতে পারলেই কেল্লাফতে। অতঃপর দেশ-বিদেশের শতশত সিনেমা হলে ছবিটির মুক্তি ঘটিয়েও দর্শকদের পদ্মিনী বা পদ্মাবতী ও আলাউদ্দিনের রগরগে প্রেমের দৃশ্য দেখিয়ে করবেন বাজিমাৎ। তখন কাতারে কাতারে দর্শকদের ভিড়ে উপচে পড়বে হলগুলি— যার ফলশ্রুতিতে উপার্জিত হবে কোটি কোটি টাকা, যা হয়ে থাকে কিছু কিছু 'বিগ বাজেট'-এর ছবির ক্ষেত্রে। কিন্তু তাঁরা ভাবতে পারেননি স্বপ্নেও যে তাঁদের সব হিসেবে উল্টে দেবে জনতা। এমন ঘটনা তো ইতিপূর্বে ঘটেনি।

সত্যি বলতে কী, সুদীর্ঘ প্রায় হাজার বছর এদেশকে শাসন ও শোষণ করেছে বিদেশি এবং বিধর্মী আক্রমণকারীরা। সংখ্যালঘু হয়েও তারা পৈশাচিক নির্যাতন চালিয়েছে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের উপর। তারা নির্মম হত্যালীলা, ধর্ষণ চালিয়ে, মন্দির ধ্বংস, বিগ্রহ অপবিত্র বা ধুলিসাৎ করে এবং লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করে হিন্দুমন থেকে মুছে দিয়েছিল তাদের শৌর্য, বীর্য, ইতিহাস, ধর্ম, সংস্কৃতি ও স্বাভিমানকে। ফলে হিন্দুরা পরিণত হয়েছিল একটি আত্মভোলা জাতিতে। তবে শক, হূণ, মুসলমান ও ইংরেজ শাসনাধীন ভারতের হিন্দুদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে মুসলমান শাসকরা। ইংরেজ শাসনে দেশ স্বাধীন হলেও সেই স্বাধীনতা এসেছে জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের মাধ্যমে। পরিণতিতে পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র হলেও ভারত হিন্দুরাষ্ট্র না হয়ে হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। আর বাম- সেকুলারবাদী তথা মেকলের ভাবশিষ্যরা সৃষ্টি করেছেন ভারতের নতুন ইতিহাস, যাতে অস্বীকার করা হয়েছে হিন্দু জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস, পরম্পরা ও মৌলিকত্বকে। বলা হয়েছে, ভারতীয়রা মিশ্রজাতি, আর্যরা বহিরাগত, বেদ-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি কাল্পনিক ইত্যাদি। ফলে হীনমন্যতায় ভোগা হিন্দুরা নিজেদের হিন্দু বলতে লজ্জাবোধ করত এতকাল। কিন্তু হিন্দুজাতীয়তাবাদী মোদী সরকার ভারতের শাসন ক্ষমতায় আসার সুবাদে হিন্দুরা ফিরে পেয়েছে স্বাভিমান, ভুলে যাওয়া ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস তথা হিন্দুত্বকে। আজ হিন্দুরা উঠেছে জেগে। তারা বাম-কংগ্রেস-সেকুলারবাদীদের হিন্দু-বিভেদ নীতিকে বর্জন করে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে। নিজেদের হিন্দু বলতে গর্ববোধ করছে। তাই তারা আজ আর হিন্দুত্বের অপমান, হিন্দু বিরোধী নীতি ও ইতিহাসকে মানতে নারাজ। এতকাল যারা হিন্দুদের অসম্মান করে মজা লুটতেন তাঁদের দিন শেষ। আজ হিন্দুরাই বলবে শেষ কথা। 'পদ্মাবতী' নিয়ে জনতার বিদ্রোহ হিন্দু স্বাভিমানবোধেরই প্রতিফলন, হিন্দু জাতীয়তাবাদের অঙ্গ।

—ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া।

বনশালীর 'পদ্মাবতী'

একটা মিথ্যাচারের মধ্য দিয়ে পরিচালক সঞ্জয়লীলা বনশালীর 'পদ্মাবতী' ছবিটি বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে গেছে। এই সুযোগে পশ্চিমবঙ্গের সেকুলারবাদী কলমচিরা স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় সঞ্জয় বনশালীর হয়ে গর্জে উঠেছেন।

সেকুলারবাদীরা তাদের সেকুলারি চিন্তাধারার কসম খাওয়া কলমে 'পদ্মাবতী' নিয়ে নিত্য নতুন কাহিনি ফেঁদে ইতিহাসের সত্যকাহিনিটি বেমালুম ভুলিয়ে দেওয়ার অপকর্মে লিপ্ত হয়েছেন। এটা একটা অবধারিত মিথ্যার বেসাতির খেলা। বিদেশি শক্তির মদতপুষ্ট বুদ্ধিজীবী এবং কতিপয় রাজনীতিকের এই মিথ্যাবেসাতির সন্ধিপর্বের সান্ধ্যলগ্ন প্রাক-ব্রিটিশপর্বে এবং পরবর্তী ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে প্রকট ছিল। ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর এই রোগ আজকের ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবী ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিকদের বেশি করে পেয়ে বসেছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক পত্রিকার পাতায় এক কলমচি বর্তমান 'পদ্মাবতী' বিতর্ক প্রসঙ্গে এক জায়গায় লিখেছেন— 'সংগ্রামের রং লাল, তারুণ্যের রং সবুজ, কলঙ্কের রং কালো যদি হয় তবে অসহিষ্ণুতার রং গেরুয়া।' সঞ্জয় বনশালীর ছবি 'পদ্মাবতী' বিতর্কে সঞ্জয় বনশালীর পক্ষ নিয়ে ওই লেখকের লেখা। ওই সেকুলারি কলমচিরা যারা 'পদ্মাবতী' ছবিটি নিয়ে গলা ফাটাচ্ছে তাদের শক্তির উৎসটা কোথায় তা দেখতে আমাদের ফিরে যেতে হবে পণ্ডিত নেহরুর Glimpses of World History-র পাতায় যা কন্যা ইন্দিরার উদ্দেশ্যে পত্রাকারে লেখা হয়েছিল। ১৯৩২-র ২৪ জুন পত্রাংশের কিছু অংশ— '১২৯০ খ্রিস্টাব্দে দাস রাজত্বের অবসান হয়। অল্পকাল পরেই আলাউদ্দিন খিলজি তাঁর পিতৃব্য এবং শ্বশুর জালালউদ্দিন খিলজিকে হত্যা করে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। আলাউদ্দিনের হাত থেকে নিস্তার পায়নি তৎকালীন ওমরাহগণও। আর মোগলরা যাতে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্র করতে না পারে তার জন্য কুড়ি থেকে ত্রিশ হাজার মোগলকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়।' পণ্ডিতজীর লেখা এ পর্যন্ত ইতিহাসকে

আশ্রয় করেই এগিয়ে গেছে। পরবর্তী পত্রাংশে আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের উল্লেখ আছে। কন্যা ইন্দিরাকে লিখেছেন— 'চিতোরের কথা তুমি জানো। বীরত্ব ও রোমান্সে ভরা এই চিতোর। প্রাচীন যুদ্ধরীতির পরিবর্তন না করার ফলে আলাউদ্দিনের সুশিক্ষিত সৈন্যদলের নিকট চিতোর দুর্গের পতন হয়েছিল। ঘটনাটা ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে ঘটেছিল। দুর্গের পতন আসন্ন জেনে নারী ও পুরুষ চিরাচরিত প্রথানুসারে জহরব্রত করে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। জহরব্রত হলো পরাজয় আসন্ন যখন তখন পুরুষরা সকলে একে একে বার হয়ে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেয় আর মেয়েরা ঝাঁপিয়ে পড়ে চিতাশয্যায়। স্ত্রীলোকদের পক্ষে এটা সাংঘাতিক কাজ। আমার তো মনে হয় মেয়েরাও তলোয়ার হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলে ভাল হতো। সে যাই হোক দাসত্ব ও মর্যাদাহানির চেয়ে শ্রেয়।'

পণ্ডিত নেহরুর দীর্ঘপত্রাংশের চিতোরের গৌরবময়ী রানি পদ্মিনীর গৌরবগাথার কোনো উল্লেখ নেই। কন্যা ইন্দিরার নিকট রানি পদ্মিনীর নামটি অনুল্লেখিত রাখার মধ্যেই কি ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাস রচনার গোপন অভিসন্ধি লুকানো ছিল? রাজপুতানার অন্তর্গত চিতোরের ইতিহাসে পদ্মিনীর গৌরবগাথা কেবলমাত্র জহরব্রত করে প্রাণ বিসর্জন দিল? ইতিহাস বলছে ১৩০১ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজি চিতোর আক্রমণ করেন। বেশ কয়েকমাস চিতোর অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। আলাউদ্দিন চিতোর জয়ের কোনো আশা দেখতে না পেয়ে কপটতার আশ্রয় নিলেন। চিতোরের মহারানা ভীম সিংহকে সন্ধির জন্য চিতোরের অদূরে আলাউদ্দিন খিলজির সেনা ছাওনিতে আমন্ত্রণ করলেন। রাণা ভীম সিংহ সেনা ছাওনিতে উপস্থিত হওয়া মাত্র বন্দি করা হলো এবং শর্ত আরোপিত হলো পদ্মিনীকে আয়নার মাধ্যমে মুখ দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। পদ্মিনী এই সংবাদ শোনামাত্র সাতশত পাল্কিতে তিন হাজার পাঁচশত রাজপুত সেনা নিয়ে আলাউদ্দিনের ছাওনিতে পৌঁছালেন এবং আলাউদ্দিনের সেনার সঙ্গে সন্মুখ সমরে যুদ্ধ করে স্বামী ভীম সিংহকে মুক্ত করে আনলেন। এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে আলাউদ্দিন এক বছর পর পুনরায় চিতোর আক্রমণ করলে চিতোরের রাজপুতরা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত যুদ্ধ করে প্রাণ দিলেন।

এদিকে রানি পদ্মিনী চিতা তৈরি করে রেখেছিলেন। চৌদ্দ হাজার রাজপুত রমণী আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। এখানে পণ্ডিত নেহরু কোন দৃষ্টিতে চিতোরের ইতিহাসে রোমান্সের কথা উল্লেখ করলেন?

সঞ্জয় বনশালী ছবিতে চিতোরের গৌরবময়ী রানি 'পদ্মাবতী' আলাউদ্দিন খিলজির সম্মুখে নৃত্যরত ভূমিকায় এবং প্রেমালাপের দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। এইখানেই সারা ভারতবর্ষ জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। সঞ্জয় বনশালীর পক্ষ নিয়ে কলকাতার এক দৈনিকের কলমচি 'পদ্মাবতীর মুণ্ডচ্ছেদ ফতোয়া : অন্ধকারের শক্তিসাধনা আর কত দিন' নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃতি দিয়ে কট্টর প্রতিবাদীদের সমঝে দিয়ে লিখেছেন— 'সিনেমা একটা শিল্প, ইতিহাসের হুবহু অনুসরণ ও অনুকরণ সেখানে সম্ভব নয়, বাঞ্ছিত নয়। ঠিক যেমন সাহিত্যে।' ওইসব ধর্মনিরপেক্ষ কলমচিদেরকে বোঝাবে-কে চিতোরের রানি 'পদ্মিনী' আর সঞ্জয় বনশালীর ছবির 'পদ্মাবতী' ভিন্ন চরিত্র নয়। একটা অভিন্ন চরিত্রের বিকৃতি ঘটানো ইতিহাস বিকৃতির গভীর ষড়যন্ত্র। ভারতীয় গৌরবগাথা ও মর্যাদার ইতিহাস আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের নিকট সঠিকভাবে তুলে ধরা ছবি নির্মাতাদের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

—বিরূপেশ দাস,
বর্ধমান।

একযাত্রায় ভিন্ন ফল

বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় জনতাই জনার্দন। তাই রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতা লাভের জন্য ভোট সংগ্রহের ফাঁদ পেতে রয়েছে কেউবা শ্রমিক শ্রেণীর নামে, আবার কেউবা গরিষ্ঠ সংখ্যালঘুর উন্নয়নের নামে। উদ্দেশ্য রাজ-আসনে আসীন হওয়া, এ খেলায় বামপন্থীরা দীর্ঘ ৩৪ বৎসর সফল ভাবে রাজ ক্ষমতায় থেকে বাংলায় আপামর জনগণের সর্বনাশ করে বিদায় হয়। সেই রাজতকমায় আজ মহারানি। এই খেলা আরও বিপদজনকভাবে ঘটছে।

কয়েক বৎসর আগে বাংলায় ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির প্রতি বুদ্ধিজীবী বা বামপন্থী বা শাসকশ্রেণীর কেউই গুরুত্ব দেয়নি। এমনকী প্রচার মাধ্যমও দূরে থেকেছে। তাই মেছেদায় এক যুবকের জিব কেটে নেওয়ার মতো ঘটনারও সংবাদপত্রে (ব্যতিক্রম স্বস্তিকা) ঠাঁই হয়নি, তেমনি ভাবে ঠাঁই হয়নি মুর্শিদাবাদের মানোয়ারা খাতুনকে শৈলেন্দ্র প্রসাদ বিবাহ করে, সুখের সঙ্গে ঘর করলেও শৈলেন্দ্রনাথ শ্বশুরবাড়িতে এলে তাকে খুন করা হয়। বারাসতের রোহানা সুলতানকে অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করার ফলশ্রুতিতে অর্ককে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়। গুরুতর ভাবে পুড়ে গিয়ে চিরদিনের মতো পঙ্গু হয় অর্ক। বেলেপুরের চায়নাবিবিকে কেশব মাহাতো বিবাহ করলে কী হবে, চায়নাবিবির আত্মীয়রা কেশব মাহাতোকে খুন করে।

শান্তিপুরের শিক্ষক লিয়াকৎ আলির মেয়েকে চঞ্চল সাধুখাঁ বিবাহ করে। লিয়াকৎ আলি লোকজন নিয়ে গিয়ে চঞ্চলের বাড়িতে হামলা চালায়। চঞ্চলকে না পেয়ে তার বাবা রাধানাথ সাধুখাঁকে হত্যা করে। ওসব ঘটনায় আমাদের ভাষা ও চেতনা যেমন নির্বাক থাকে, তেমনি গণমাধ্যমও। সর্বোপরি বিবাহিত আফরাজুলের মৃত্যুকে নিয়ে সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম সেবা করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। যে কোনো মৃত্যু দুঃখজনক ঘটনা।

এর প্রতিবাদ সকলেরই করা উচিত। কিন্তু রাজপদক ও বৃত্তিলোভী বুদ্ধিজীবী সমাজ, সুশীল সমাজ, শিল্পী-সাহিত্যিক গোষ্ঠীরা আজ রাজভোগের সমাজে বিচরণ করাকে শ্রেয় বলে মনে করে, তেমনি প্রচারমাধ্যমও আজ তার নির্ভীক চরিত্র সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলছে। সকলেই আজ রাজসুয়োরানির দলে।

—রাধাকান্ত ঘোড়াই,
ডাবুয়াপুকুর, পূর্ব মেদিনীপুর।

ডাকটিকিটে স্বামী বিবেকানন্দ

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

ভারতীয় ডাকটিকিটে

১. ১৯৬৩ সালের ১৭ জানুয়ারি ভারতের ডাকবিভাগ ১৫ নয়া পয়সা দামের রঙিন স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে। এই ডাকটিকিটে ইংরেজিতে স্বামীজীর স্বাক্ষর

দেখতে পাওয়া যায়।

২. ১৯৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ভারত ২০০ পয়সা দামের রঙিন স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে। বিষয় : স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষ।

৩. ১৯৯৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর প্রকাশ পায় ৫০০ পয়সা দামের রঙিন স্মারক ডাকটিকিট। বিষয় : বিবেকানন্দ শিলা স্মারক, কন্যাকুমারী। শিলা স্মারক মন্দিরের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ডাকটিকিটটি প্রকাশিত হয়। সঙ্গে প্রথম দিনের আবরণী বা খাম (First Day Cover)। ১০ লক্ষ ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়, প্রতিটি শিটে ২০টি ডাকটিকিট ছিল, প্রতিটি টিকিটের মাপ ২.৯০×৭.৮২ সেমি এবং ছাপানো অংশ ২.৫৫×৭.৪৫ সেমি। ফোটো অফসেট পদ্ধতিতে ডাকটিকিটগুলি ছাপানো হয়েছিল। ছেপেছিল কানপুরের কলকাতা সিকিউরিটি প্রিন্টার্স লিমিটেড।

৪. ২০১৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধ জন্মশতবর্ষে চারটি বহুরঙা স্মারক ডাকটিকিট ও প্রথম দিনের আবরণী খাম প্রকাশিত হয়। ডাকটিকিটগুলির দাম যথাক্রমে ২০ টাকা (প্রেক্ষাপট : দক্ষিণেশ্বর মন্দির ও স্বামীজীর পাগড়ি পরিহিত ছবি), ৫ টাকা (প্রেক্ষাপট : বিবেকানন্দ শিলা ও দণ্ডি হাতে মণ্ডিত মস্তক স্বামীজীর পরিব্রাজক বেশে ছবি), ৫ টাকা (প্রেক্ষাপট : শিকাগো মঞ্চ ও হল, স্বামীজীর পাগড়ি পরিহিত বেশ) এবং ৫ টাকা (প্রেক্ষাপট : বেলুড় মঠ ও পাগড়ি বিহীন চুলে স্বামীজীর ছবি)।

৫. ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে 'Makers of India' সিরিজের একটি ডেফিনিটিভ স্ট্যাম্পে একরঙা আবক্ষ ছবিতে স্বামীজীকে পাওয়া যায়। ডাকটিকিটটির মূল্য ছিল ৫ টাকা। এই আলোচনায় সবকটি ডাকটিকিটের ছবি, প্রথম দিনের আবরণী ও সংশ্লিষ্ট ফিলাটেলিক ডকুমেন্ট পরিবেশন করছি।

শ্রীলঙ্কার ডাকটিকিটে :

১. স্বামীজীর কলম্বো বিজয়ের শতবর্ষে শ্রীলঙ্কার শ্রদ্ধার্ঘ্য এই ডাকটিকিট। ১৮৯৭ সালের ১৫ জানুয়ারি শিকাগো বক্তৃতা পর্বের পর ভারতীয় উপমহাদেশে কলম্বোর মাটিতে পা দেন স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীলঙ্কার মানুষ তাঁকে অভূতপূর্বভাবে স্বাগত জানান। বিশ্বজয়ের পর প্রাচ্যে প্রথম জনসমাবেশে ভাষণও দেন তিনি। সেই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে শ্রীলঙ্কার তরফে এক ফিলাটেলিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৭ সালের ১৫ জানুয়ারি শ্রীলঙ্কায় প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকিটটির মূল্য ২.৫০ টাকা। ডাকটিকিটে স্বামীজীর একটি প্রোট্রেট ও

গ্লোবের ছবি আছে, স্ট্যাম্পটির ফরম্যাট উল্লম্ব। ডাকটিকিটের নকশা করেছিলেন এস. এস. সিট্রা। চার রঙা এই টিকিটটির আকার ৪০×৩০ মিলিমিটার, ছিদ্র ১৩.৫, সঙ্গে ট্রপিক্যাল গাম। মোট ১০ লক্ষ টিকিট ছাপানো হয়েছিল; প্রতিটি পাতায় ৫০টি টিকিট; ছাপানো হয় অফসেট লিথোগ্রাফি পদ্ধতিতে, ভরেনের ওরিয়েন্টাল প্রেস থেকে।

২. সার্ধ শতবর্ষে স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ শ্রীলঙ্কার :

স্বামীজীর সার্ধ শতবর্ষ (২০১৩ সালের ১২ জানুয়ারি) শ্রীলঙ্কার ডাকবিভাগ একটি ডাকটিকিট প্রকাশের মাধ্যমে স্মরণ করে। ডাকটিকিটটির মূল্য ছিল ২৫ টাকা। এই স্ট্যাম্পে স্বামীজী তার পরিচিত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর আবক্ষ চিত্র। এই

উপলক্ষে প্রকাশিত প্রথম দিনের আবরণী খামটিও খুব আকর্ষণীয়; খামে বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল রক ও মন্দিরের

ছবি রয়েছে। ইংরাজিতে লেখা আছে তাঁর বহু পরিচিত উদ্ধৃতি : Arise! Awake! and Stop not till the goal is reached.

মালয়েশিয়ার ডাকটিকিটে :

২০১১ সালের ২ আগস্ট মালয়েশিয়া ৩০ সেন্ট মূল্যের একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মসার্ধশতবর্ষে শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে এই ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। স্ট্যাম্পে স্বামীজীর পাগড়ি পরিহিত পরিচিত ছবি; উপরে ইংরেজিতে লেখা 'Arise, Awake!' যা স্বামীজীর এক জগদ্বিখ্যাত বাণীর অংশ বিশেষ। বাঁ দিকে রয়েছে মালয়েশিয়ার জাতীয় পতাকার ছবি ও ডাকমূল্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মালয়েশিয়ায় রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০১ সালে। ২০১৫ সালের ২২ নভেম্বর

কুয়ালালামপুরের আশ্রম ক্যাম্পাসে প্রায় ২০০০ জন ভারতীয় মালয়েশিয়ান মানুষের উপস্থিতিতে ১২ ফুট উচ্চতার বিবেকানন্দের ব্রোঞ্জমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অনুষ্ঠানে মোদী বলেন, 'Vivekananda is neither the name of a man nor identity of a system but personifies 1,000-year-old Indian Culture.' তিনি আরও বলেন, স্বামীজী এক অখণ্ড এশিয়ার ধারণা দিয়েছিলেন, যার পরিপূর্ণ বিকাশ আজকের ASEAN এবং পূর্ব-এশিয়া সামিট। স্বামী বিবেকানন্দ ব্যক্তির নাম নয়, তিনি ভারতের আত্মা। ■

বিস্মৃতির অতলে স্বামীজীর সাধনা

ড. রাকেশ দাশ

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাস। স্বামীজী ভারতযাত্রায় রওনা হলেন বরানগর থেকে। উদ্দেশ্য, চৈতন্যময় ও অধ্যাত্মমগ্ন এই সুবিশাল ভারতভূমির প্রকৃত ঐশ্বরিক স্বরূপটি অনুধাবন করা। কৈশোরে বাবার হাত ধরে রায়পুরের পথে ভারতবর্ষের এই আধ্যাত্মিক স্বরূপটি আজন্মসিদ্ধ নরেন্দ্রনাথের মানসচক্ষে ধরা পড়েছিল। সন্ন্যাস গ্রহণের পরে কাশী, অযোধ্যা, বৃন্দাবন ও হিমালয়ের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণের সময়েও তিনি এই ঐশ্বরিক সত্তাকে অনুভব করেছিলেন। এইবার তাঁর দীর্ঘ ঐতিহাসিক যাত্রা। সাধনক্ষেত্র কলকাতা থেকে দীর্ঘ সাত বছরের প্রস্থান। তখনও বিবেকানন্দ হননি তিনি। সন্ন্যাস গ্রহণের পরে বিবিদিষানন্দ নামে পরিচিত। কখনও সচ্চিদানন্দ নামে নিজের পরিচয় দেন।

যাত্রার শুরুতেই ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক রাজধানী কাশী দর্শন করলেন নরেন্দ্রনাথ। সেখান থেকে গেলেন কাশ্মীর। সেখান থেকে রাজপুতানা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, কেরল হয়ে পৌঁছলেন কন্যাকুমারী। ভারতভূমির অন্তিম বিন্দু। এখানে প্রতিনিয়ত অনন্ত সমুদ্র তিন দিক থেকে ভারতমাতার চরণকমল বিধৌত করছে। যেন প্রকৃতি পুণ্যভূমি ভারতজননীর পাদস্পর্শে নিজেকে মলিনতা মুক্ত, পবিত্র করে তুলতে ব্যাকুল। সমুদ্রের কাছে এসে দাঁড়ালেন ভারতপথিক। মনে দৃঢ় সংকল্প। কিছু দূরে সমুদ্রের বুকে জেগে অমর একপাদ শিলা। যে প্রস্তরখণ্ডের উপর এক পায়ে দাঁড়িয়ে মাতা পার্বতী শিবের সাধনা করেছিলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি উপলব্ধি করলেন তাঁর জীবন সাধনার এই হলো যথার্থ সময় ও ক্ষেত্র। ভারতবর্ষ ও হিন্দুত্বের সুমহান ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পূতযজ্ঞ আরম্ভ করার আগে ভারত সাধনার অন্তিম চরণটি সম্পন্ন করার জন্য উপযুক্ত সাধনভূমি।

সুদীর্ঘ আড়াই বছর ব্যাপী ভারতদর্শন সমাপ্ত করে ভারতমাতার চরণতলে বসে চিন্ময়ী ভারতজননীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন পরিব্রাজক ভারতাত্মা। এই দীর্ঘ তীর্থযাত্রাতে তিনি ভারতবর্ষকে পূর্ণ ও যথাযথ রূপে উপলব্ধি করেছেন। এই যাত্রায় তিনি উন্মুক্ত গগনতলে সর্বত্যাগী সাধু, কপর্দকশূন্য ভিক্ষুকের সঙ্গে রাত্রিযাপন করেছেন, আবার রাজপ্রাসাদের রাজ-অতিথিরূপে আতিথেয়তাও তিনি পেয়েছেন; কখনও দিনের পর দিন একদানা অন্ন জোটেনি, কখনও রাজ-অনুষঙ্গে রাজভোগ আস্বাদন করেছেন; নিতান্ত নিরক্ষর অজ্ঞানীর সঙ্গ লাভ করেছেন, আবার সুগভীর তত্ত্ব আলোচনা করেছেন পরম জ্ঞানী ও তপস্বীদের সঙ্গে। বিপুল ঐশ্বর্য ও দুঃসহ দারিদ্র্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও দুর্দশা, সুপ্রকট মূঢ়তা ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, ভারত রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক ঐক্য ও ভিন্ন-ভিন্ন রাজ্যগুলির রাজনৈতিক কলহ, সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিক একাত্মতা ও ভ্রাতৃত্বের বোধ এবং জাত-পাতের নামে হীন সামাজিক বৈষম্য— এই অদ্ভুত বৈররীত্যের সহাবস্থান স্বামীজীর কাছে ভারতবর্ষের প্রকৃত চরিত্রটি উন্মুক্ত করে মেলে ধরেছিল। ভারতীয় সমাজের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তার শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ এবং বিপদগুলিকে সঠিক ভাবে নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। প্রকৃত ভারতবর্ষকে নিজের অন্তরে অনুভব করেছিলেন। ভারত সাধনার অমোঘ পরিণতি— ভারতবর্ষের পুনরাবিষ্কারের দিকে এগোচ্ছেন তিনি। সেই লক্ষ্যপূর্তির জন্য সাধনার অন্তিম সোপান— প্রত্যক্ষদৃষ্ট ভারতবর্ষের চৈতন্যময় রূপের নিদিধ্যাসন— শান্ত সমাহিত চিত্তে ভারতমাতার

সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার সাধনা।

এই পূত একপাদ শিলাকে সাধনভূমি রূপে নির্বাচিত করলেন। যুগ যুগান্তর ধরে সমুদ্রের মধ্যে জেগে থাকা এই কালাতীত প্রস্তরখণ্ড যেখানে পার্থিব কলুষ পৌঁছানোর সুযোগ পায় না; যেখানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের রত্নাকর একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয় ভারতমাতার চরণপদ্মে; সেই আশ্চর্য ভূমি যেখানে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে পশ্চিম সমুদ্রে দিবাকরের নিমজ্জন এবং অস্তমিত দিবাকরের রত্নাকরের গর্ভ থেকেই পূর্ব দিগন্তে পুনরুত্থান দেখা যায়।

ঠিক ১২৫ বছর আগে ১৮৯২ সালের ২৫ ডিসেম্বর ধ্যানমগ্ন হলেন নরেন্দ্রনাথ। ২৭ ডিসেম্বর নবজন্ম লাভ করে আত্মপ্রকাশ করলেন স্বামী বিবেকানন্দ রূপে। নরেন্দ্রনাথ রূপান্তরিত হলেন বিবেকানন্দে। আমরা পেলাম আমাদের দিগদ্রষ্টা, আমাদের সকলের প্রিয়, আপনজন, ভারতাত্মা বিবেকানন্দকে।

কন্যাকুমারী থেকে মাদ্রাজে পদার্পণ করেই খবর পেলেন শিকাগো মহাসম্মেলনের। আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য দর্শন লাভ করলেন। দেখলেন তিনি পশ্চিমের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে জলের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে দৈব নির্দেশ প্রদান করছেন পাশ্চাত্য যাত্রার। তাঁরই নির্দেশে পাশ্চাত্যের বুকের উপর দাঁড়িয়ে ঘোর অমানিশার সঘন গহন তমসাকে ছিন্ন ভিন্ন করে প্রাচ্যের দিক্‌চক্রবালে নব রবির কিরণ জাগালেন বিবেকানন্দ।

কিন্তু আজ স্বামীজীর সাধনার দিনে আমাদের ভূমিকা বিপরীত। প্রকাশ থেকে অন্ধকারের দিকে যাত্রায় ব্যস্ত আমরা। ২৫ ডিসেম্বর ভারতীয় সমাজের মাতামাতি দেখে মনে হয় দিনটি যীশুর জন্মদিন নয়, তাঁর অন্তিম নৈশভোজের দিন। সামাজিক গণমাধ্যমে মেরি ক্রিসমাসের ছড়াছড়ি।

বিশ্বের ইতিহাসে ২৫ ডিসেম্বর একটি অতি পবিত্র দিন। কিন্তু আত্মবিস্মৃতি ও সাংস্কৃতিক পরাধীনতায় আমরা ভুলতে বসেছি ইতিহাস। স্যার আইজ্যাক নিউটন, মহাকবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ভারতবর্ষের সর্বকালের অন্যতম সেরা সুরকার নৌশাদ, রাষ্ট্রীয়তাকে বৈদেশিক সাংস্কৃতিক আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিজের শরীরের রক্ত জল করে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপকার মহামনা মদনমোহন মালব্যের জন্মদিন রূপে ২৫ ডিসেম্বর বিস্মৃত। প্রবাদপ্রতিম প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর কথা না হয় রাজনৈতিক উন্নাসিকতার কারণে তোলা থাক।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিপদের কথা হলো, ২৫ ডিসেম্বরে এই কথা মনে করিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা করলে ভয়ঙ্কর সমস্ত বাক্যবাণ ধেয়ে আসে তথাকথিত বিবেকানন্দ ভক্তদের দিক থেকে। তারা স্মরণ করিয়ে দেন বিবেকানন্দ যিশুর প্রতি কতটা শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। তারা স্মরণ করান রামকৃষ্ণ মঠে ক্রিসমাস ইভের সন্ধ্যায় যিশুর উপাসনার কথা।

কিন্তু তারা বিস্মৃত হয়েছেন স্বামীজীর ভারত সাধনার ১২৫ তম বর্ষে আমরা পদার্পণ করেছি। তারা বিস্মৃত হয়েছেন স্বামীজীর সন্ন্যাস গ্রহণের পবিত্র দিনটির কথা। তারা বিস্মৃত হয়েছেন আমেরিকার বুকে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, 'পাদরি তোমরা ভারতবর্ষে খ্রিস্টমতের প্রচার বন্ধ কর। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতায় তোমরা এখনও আমাদের কাছে শিশু।'

স্বামীজী বা বলা ভাল ভারতবর্ষের মতের সঙ্গে যিশুর মতের মৌলিক পার্থক্যখানি খুব সহজ ও সরল। ভারতবর্ষ সৃষ্টির প্রতিটি কণায় ঈশ্বরের উপলব্ধির কথা শোনায়, সকলকে আহ্বান করে অমৃতের সন্তান বলে, সকলকে জানায় যে তুমিই সেই অবিনাশী আত্মস্বরূপ। যিশুর মতে আমরা সকলেই এক-একটি জঘন্য পাপের ফলস্বরূপ। এই মৌলিক পার্থক্যেই আমাদের সব পাল্টে যায়।

দুর্ভাগ্য আমাদের ২৫ ডিসেম্বরের ভারতাত্মা বিবেকানন্দ ও ভারতীয় ভাবধারাকে ভুলে আমরা মেতে উঠেছি পাপের আরাধনায়, সেই আরাধনার উপচার বৈদেশিক সুরা এবং তামসিকতায় আচ্ছন্ন বিকৃতি। মানব কল্যাণের ব্রত ভুলে মেতে উঠেছি নোংরা বিলাসিতার আবিলতায়। নিজেদের অমৃত স্বরূপ ভুলে নিজেদের পাপের সন্তান মনে করে ধ্বংসের পথের পথিক হয়েছি।

পাপের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে ভারতজননীর অমৃতপুত্র বিবেকানন্দ, মালব্যদের মানবকল্যাণের বাণী। তবু আজও আত্মবিস্মৃতির পাপ ও মানসিক পরাধীনতার ভয়ানক গ্লানির বোঝার তলা থেকে ক্ষীণ আহ্বান— হে ভারত ভুলিও না...।

(লেখক অধ্যাপক, সংস্কৃত অধ্যয়ন বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়)

অঙ্গনা

সুতপা বসাক ভড়

সূর্য সৌরজগতের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, যার কিরণে আলোকিত আমাদের এই বিশ্ব চরাচর। সমগ্র সৃষ্টিচক্রের নিয়ন্তা হলো সূর্য। সূর্য আমাদের সর্ব শক্তির উৎস, আমাদের অন্নদাতা, জীবনদাতা— সেজন্য ভারতীয় সংস্কৃতিতে সূর্যের স্থান অনেক উঁচুতে। সূর্যকে ঈশ্বরজ্ঞানেও পূজা করে থাকি আমরা। আমাদের পৃথিবী থেকে অনেক দূরে থাকা সত্ত্বেও সূর্যের কিরণের দ্বারা আমাদের জীবনচক্র নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে ঘুরে চলেছে। সূর্যের কিরণ, যাকে আমরা রৌদ্র বলে থাকি, আমাদের জন্য খুবই উপকারী। আমরা জানি যে, রৌদ্র থেকে আমাদের যে ভিটামিন-ডি মেলে, তা আমাদের শরীরের কার্যপ্রণালী সুষ্ঠুভাবে চালাতে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে। সৌর কিরণ যেখানে পৌঁছায়, সেখানে রোগজীবাণু বেঁচে থাকতে পারে না এবং অন্যান্য রোগের সম্ভাবনাও কমে যায়। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ বেদেও সূর্যপূজা গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। রৌদ্রের মধ্যে যে রোগনাশক ক্ষমতা আছে, সে ব্যাপারে উল্লেখ করে অথর্ববেদে বলা হয়েছে যে, সূর্য ওষধি বানায়। সেজন্য আমাদের পরম্পরায় সূর্য নমস্কারের সঙ্গে সঙ্গে শরীরে ভিটামিন-ডি আত্মসাৎ করার প্রচলন আছে। বাচ্চাদের তেল মালিশ করে রৌদ্রে শোয়ানোর পেছনেও একই কারণ বিদ্যমান। বাস্তবে, আমাদের শরীরের ৯০ শতাংশ ভিটামিন-ডি মেলে সূর্যকিরণ থেকে।

মজবুত শরীরের জন্য রৌদ্রের খুবই প্রয়োজন। পর্যাপ্ত সূর্যকিরণে থাকলে শরীরের অস্থি মজবুত হয়। শরীরের অস্থি যদি পর্যাপ্ত রৌদ্র না পায়, তাহলে তা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যায় এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্থি সংক্রান্ত অসুখ, যেমন— বাত-বেদনা প্রভৃতি রোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সকালের রোদ শরীরের জন্য সব থেকে বেশি লাভপ্রদ। রৌদ্রে শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং সোরাইসিস নামক ত্বকের অসুখ থেকে রক্ষা করে। সূর্যকিরণ আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য ভাল রাখে এবং সিজোফ্রেনিয়া নামক রোগের সম্ভাবনা কম করে। আমাদের শরীরে মেলাটোনিন নামক হরমোন রৌদ্রেই বিকশিত হয়, ফলে রাত্রে সুনিদ্রা হয়।

সম্প্রতি একটি নতুন গবেষণা সূত্রে জানা গেছে সূর্যের কিরণ এবং বিএমআই (বেসিক মেটাবলিক ইনডেক্স) বা শারীরিক প্রক্রিয়ার মধ্যে ভাল সম্বন্ধ আছে, সেজন্য প্রত্যেকদিন রোদ লাগালে ওজনও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকবে। ওই গবেষণায় বলা হয়েছে যে প্রত্যেকদিন সকালে ২০-৩০ মিনিট রোদ লাগালে শারীরিক ঘড়ি (বডি ক্লক) ঠিকমতো কাজ করে, পাচনক্রিয়া, খিদে এবং শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকে এবং বিএমআই বাড়ে না। রৌদ্র কিরণ পাচনক্রিয়া সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করে, ফলে মধুমেহ এবং হৃদয়রোগ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে। আমাদের দেশের জনসংখ্যার ৮০ শতাংশের মধ্যে ভিটামিন-ডি-র অভাব পাওয়া গেছে; অথচ আমাদের দেশে সূর্যরশ্মি পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।

পশ্চিমি দেশগুলিতে, যেখানে বরফ পড়ে, সেখানে কখনও কখনও রৌদ্রের দেখা পাওয়া যায়, সেজন্য ওইসব দেশের বাসিন্দাদের মধ্যে নিরাশা, একাকীত্ব, অরুচি এবং নেতিবাচক চিন্তাভাবনার প্রকাশ দেখা যায়। ডাক্তারদের মতে, শীতকালে 'উইন্টার ব্লুজ' নামক একটি সমস্যা উত্তর ভারতে বেশি চোখে পড়ে। যাঁরা নিয়মিত রোদ লাগান তাঁরা দীর্ঘজীবন লাভ করেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, নিয়মিত রোদ লাগালে 'ভাল আছি' (ফীল গুড) ভাবনা মনে জন্মায়। সুইডেনের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হাকন ওলসন গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে ভিটামিন ডি রক্তজমা, মধুমেহ এবং টিউমারের বিরুদ্ধে শরীরের মধ্যে আবশ্যক প্রতিরোধ ক্ষমতা দেয়। প্রতি বছর ব্রিটেনে ২৫ হাজার লোকের মৃত্যুর মুখ্য কারণ অত্যধিক ঠাণ্ডায় রক্ত জমে যাওয়া।

সূর্যরশ্মির সাহায্যে সবুজ লতা-গুল্ম, গাছপালা, ফুল-পাতা ইত্যাদি জীবনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে, যার ফলে সম্পূর্ণ জীবনচক্র সুচারু রূপে নিয়ন্ত্রিত হয়। দেশি গোরুর দুধেও রৌদ্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকে। রৌদ্রে গোরু শিরদাঁড়া বরাবর সূর্যকেতু নাড়ী দ্বারা সূর্যের কিরণ থেকে ভিটামিন-ডি এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় রশ্মি শরীরে আত্মসাৎ করে উপকারী ভিটামিন এ-২ সমৃদ্ধ দুধ দেয়। আবার যেসব গোরুকে ঘরের ভেতর বেঁধে রাখা হয়, তাদের দুধে ভিটামিন-ডি পাওয়া যায় না। সুতরাং সূর্যরশ্মির প্রভাব আমাদের জীবনে অপরিসীম। নিয়মিতভাবে রোদ লাগালে আমরা সুস্থ জীবনের অধিকারী হতে পারি।

এ ব্যাপারে পরিবারের সদস্যদের অণুপ্রেরণাদাত্রীর ভূমিকা নিতে পারেন কেবলমাত্র মহিলারাই। ■

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে খরিফ ভুট্টার চাষ

ড. মানবেন্দ্র রায় ও অঙ্কিতা বেগম

ভুট্টা একটি অন্যতম প্রধান খাদ্যশস্য। ধান ও গমের পরেই তার প্রাধান্য। এটি শুধুমাত্র মানুষের খাদ্যই নয়, পশুদেরও একটি অন্যতম বিকল্প খাদ্য। ভুট্টার চাহিদার জন্যই তাকে 'শস্যের রানি' বলা হয়। অন্যান্য যে-কোনো শস্যের তুলনায় এর ফলনের হার বেশি; তাই একে 'অলৌকিক শস্য'ও বলা হয়। ভুট্টাতে ১০ শতাংশ-এর মতো প্রোটিন পাওয়া যায়, যেটি ধানের থেকেও বেশি। এই শস্যটিকে বছরের প্রধান তিনটি চাষযোগ্য সময়— খরিফ, রবি এবং জৈত ঋতুতে চাষ করা যায়।

ভারতবর্ষে প্রায় ৬ মিলিয়ন হেক্টর চাষযোগ্য জমিতে ভুট্টার চাষ হয়। দেশে ভুট্টার ফলন প্রায় ১৬ মিলিয়ন টন। ভুট্টাকে বিভিন্নভাবে খাওয়া হয়। এটিকে ছোটো এবং কচি অবস্থায় সেদ্ধ করে বা ছাড়িয়ে খাওয়া হয়, তাছাড়া রান্না করেও খাওয়া যেতে পারে। খুব কচি ভুট্টাকে বেবি কর্ন বলে। পপ কর্ন বা ভুট্টার খইও একটি অত্যন্ত সুস্বাদু এবং জনপ্রিয় খাবার। ভুট্টার আটা বা ময়দা দিয়ে রুটি, পরোটা ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এছাড়া নানাবিধ সুস্বাদু ও মুখরোচক খাবার তৈরি করতে ভুট্টার ময়দা বা কর্ন ফ্লাওয়ার ব্যবহৃত হয়।

জলবায়ু ও মৃত্তিকা : ভুট্টা চাষের উপযোগী তাপমাত্রা হলো ২১° - ৩২° সেন্টিগ্রেড; বীজ অঙ্কুরোদগমের সময় ২০-২২° সেন্টিগ্রেড এবং বৃদ্ধির সময় ৩০-৩২° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা প্রয়োজন। উচ্চ তাপমাত্রা এবং কম আর্দ্রতা ফুল ফোটার সময় বিশেষ বাধা হয়ে দাঁড়ায়; ফলন ঠিকঠাক হয় না।

ভুট্টা চাষের ক্ষেত্রে দোঁয়াশ মাটি সর্বোপযুক্ত। চাষের সময় মাটিতে সঠিক পরিমাণ রস বজায় রাখতে হবে। আর্দ্রতা বেশি বা কম হলে ফলনের ক্ষতি করবে, তাই নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক হওয়া দরকার।

জমি তৈরি ও পরিচর্যা : বীজ বোনার আগে জমিতে ভাল করে চাষ দিতে হবে এবং পরে আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। সাধারণত হালকা মাটিতে ১ বার এবং শক্ত মাটিতে ২-৩ বার ভালভাবে লাঙ্গল দিতে হবে। তার সঙ্গে ১-২ বার মই দিতে হবে।

বীজ বপন : সংযুক্ত বীজের ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি ১৮-২০ কেজি এবং সংকরায়ণ বীজের ক্ষেত্রে ২০-২৫ কেজি বীজ লাগে। খরিফ মরশুমে মে থেকে জুন মাসে বীজ বোনা হয়। বীজ বোনার আগে ৩ গ্রাম প্রতি কেজি বীজে ব্যাভিস্টিন দিয়ে শোধন করে নেওয়া উচিত। বীজগুলিকে ৬০ × ২০ সেন্টিমিটার দূরত্বে বসানো হয়। এগুলিকে গ্রীষ্মকালে 'রীজ ও ফারো' বা সীতা-খালি উপায়ে মাটিতে বপন করা হয়, যাতে বৃষ্টির জলে ভুট্টার ক্ষতি না হয়।

সার প্রয়োগ : বীজ বপনের আগে জমিতে ১০-১৫ টন গোবর সার প্রয়োগ করা হয় যেটি জমির উর্বরতা এবং জলধারণ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। সাধারণত সংকর বীজের ক্ষেত্রে ১৫০ কেজি নাইট্রোজেন, ৭৫ কেজি ফসফেট এবং ৭৫ কেজি পটাশ প্রতি হেক্টরে প্রয়োগ করা হয়। এবং সংযুক্ত বীজের ক্ষেত্রে ১০০ কেজি নাইট্রোজেন, ৫০ কেজি ফসফেট এবং ৫০ কেজি পটাশ প্রতি হেক্টরে প্রয়োগ করা হয়। অর্ধেক নাইট্রোজেন বীজরোপণের সময় এবং বাকি $^{১}/_{৪}$ ভাগ করে নাইট্রোজেন বীজ লাগানোর যথাক্রমে ২৫ দিন ও ৪৫ দিনের মাথায় প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনীয় ফসফেট ও পটাশ বীজ বপনের সময় দিতে হবে।

সেচ ব্যবস্থা : ভুট্টা গাছ অতিরিক্ত জল বা কম জল উভয় ক্ষেত্রেই সংবেদনশীল। শস্যটির পুরো জীবনকাল বাবদ ৪০০-৬০০ মিলিমিটার জলের প্রয়োজন হয়। পুষ্পোদ্‌গম (ফুল দশা) এবং ফল ধারণের সময় জলের ঘাটতি হলে ফলন ২০ শতাংশ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং সেচের সুবন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক।

আগাছা দমন : বীজ অঙ্কুরোদগমের সময় থেকেই আগাছা জন্মানো শুরু করে, তাই আগাছা দমন খুবই প্রয়োজনীয়। সাধারণত শ্যামা ঘাস, দূর্বা ঘাস জন্মায়। এজন্য ৩-৪ বার নিড়ানি দিয়ে আগাছা উত্তোলন করতে হবে। আগাছা জন্মানোর আগে অ্যাট্রাজিন হেক্টরে ১-১.৫ কেজি হিসেবে প্রয়োগ করা উচিত। ভুট্টার সঙ্গে কলাই বা শুঁটি জাতীয় কিছু গাছ যেমন ধঞ্চে, শণ, বরবটি লাগিয়ে ২৫-৩০ দিন পর সেগুলিকে কেটে মাটিতে মিশিয়ে দিলে আগাছা দমনে সুবিধা হয়।

কীট-পতঙ্গ ও রোগ-বালাই :

মাজরা পোকা : মাজরা পোকার অপূর্ণাঙ্গ বা লার্ভা দশা শস্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। এই ধরনের কীট দমনের জন্য ২ কেজি কার্বারিন ৫০ ডব্লু পি ১০০০ লিটার জলের মধ্যে মিশিয়ে, বীজ পোতার ১৫ দিন পরে ফসলে প্রয়োগ করা হয়।

গোলাপী মাজরা : পোকাটি সাধারণত দেরিতে বপন করা শস্যকে আক্রমণ করে। এই পোকাটির আক্রমণ দূর করার জন্য কার্বারিল ব্যববার করা হয়।

পাতা ধসা : রোগটি সাধারণ পাতায় দেখা যায়। রোগের প্রতিকার হিসেবে জিনের বা মানের ২.৫-৪ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে ৮-১০ দিন অন্তর ২-৪ বার স্প্রে করা হয়।

ফলন : ভুট্টা চাষ করে হেক্টরে ৫০-৬০ কুইন্টাল শস্য উৎপাদন করা যায়। সংকর ভুট্টার ক্ষেত্রে এবং সংযুক্ত ভুট্টার ক্ষেত্রে ৪৫-৫০ কুইন্টাল শস্য ফলন পেতে পারি।

(লেখকদ্বয় বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এর সঙ্গে যুক্ত)

পুরাণের এক মনোজ্ঞ আলোচনা

পুস্তক প্রসঙ্গ

অভিজিৎ রায়চৌধুরী

পুরাণ ভারতীয় জনজীবনের এক অসাধারণ অনুষঙ্গ। সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে পুরাণের চর্চা প্রচলিত। রামায়ণ, মহাভারত-সহ বিভিন্ন পুরাণ এই দেশের মানুষকে যুগ যুগ ধরে জীবনপথ নির্ধারণে সাহায্য করেছে। আজও পুরাণের ভূমিকা জনজীবনে অত্যন্ত ইতিবাচক এবং প্রাসঙ্গিক। পণ্ডিত জনেরা 'পুরাণ'কে ইতিহাস বলে গণ্য করেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত 'পুরাণ' ঘটে যাওয়া ঘটনায় বিবরণ। কথকগণ শাসক বা রাজাদের নির্দেশে অথবা কোনো উপলক্ষে বর্ণনা করতেন। আজও গ্রাম বাংলায় পুরাণপাঠ প্রচলিত জনবিনোদনের মাধ্যম হিসেবে। পুরাণ-কথকগণ পরিবর্তনশীল দেশাচার, লোকাচার ইত্যাদির গুরুত্বকে মাথায় রেখে পুরাণ কাহিনি পরিমার্জন করেছেন মূল ঘটনা এবং তা থেকে নিঃসৃত নীতি ও সিদ্ধান্তকে অবিকৃত রেখে। এ বিষয়ে তাঁদের সচেতনতা এবং নিষ্ঠা প্রশংসনীয়।

'পুরাণ কথা' বইতে লেখক কানাইলাল মণ্ডল আধুনিক যুগের অব্যবস্থিত তথাকথিত আধুনিকতার সঙ্গে দেশের সুপ্রাচীন মূল্যবোধের একটা তালমেল করতে চেয়েছেন। ১ম প্রচ্ছদ থেকে ৪র্থ প্রচ্ছদ মোট ৬৪ পাতার মধ্যে ৫০টি পাতায় বিধৃত ১৫টি রচনা। প্রধানত পৌরাণিক ঘটনাবলী। 'শাপমুক্তি' (পৃ. ৭) শুরু হয়েছে আমাদের স্মৃতিমেদুর 'দাদুর গল্প বলার' আবহে। সাবলীল, সহজবোধ্য ভাষায় পৌরাণিক ঘটনার বিবরণ অনাবিল ধারায় এগিয়ে চলে—পাঠককে আবিষ্ট করে রাখে। পাঠকের গল্প পাঠের আনন্দ এবং নীতিবোধের উপলব্ধি হয়। বর্তমান সমাজ জীবনে নীতিহীনতার প্রকোপ এবং অস্থিরতা নিয়ে চিন্তাশীল মানুষ উদ্বিগ্ন; এর থেকে রেহাই পেতে তথাকথিত বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণা এবং আলোচনা আমাদের দেশ সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চলছে। সুফল কতটা পাওয়া গেছে তা নিয়ে নিঃসংশয় হওয়া যাচ্ছে না। লেখক বইয়ের ভূমিকায় সঠিক ভাবেই বলেছেন, 'নতুনকে গ্রহণ করতে গিয়ে অতীব গুরুত্ব ও জ্ঞানমূলক কাহিনি বিস্মৃত হই।... জ্ঞানীগুণী, মনীষী ও মুনিঋষিদের মুখনিঃসৃত বাণী ও উপদেশ আমাদের জীবন পথে চলার সময় একান্ত প্রয়োজন।'

মানব জীবনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং তার প্রভাব, প্রমাণ একটি বহু আলোচিত বিষয়। লেখক 'কে বলে ঈশ্বর নেই' (পৃ. ১৭), 'জন্মরহস্য' (পৃ. ৫৪) রচনাগুলিতে এবিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। 'গুরুদেব ও তিন শিষ্য' (পৃ. ৩২) রচনাটিতে রূপকের আড়ালে এক গভীর, গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক দিক নির্দেশের অবতারণা করেছেন যা প্রশংসনীয়।

সাধারণত পুরাণ, মহাকাব্য ইত্যাদি নিয়ে দেশের বিদগ্ধ সমাজে প্রকাশ্য আলোচনা দেখা যায় না। বিপরীতে এই গ্রন্থগুলির বিরূপ সামালোচনা এবং কালের নিরিখে অচল— ইত্যাদি তত্ত্বের সুলভ সমাহার বহুল পরিমাণে দেখা যায়। এঁদের মতে ভারতের পুরাণ, উপনিষদ, মহাকাব্য-সহ বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থকে বড়জোর উৎকৃষ্ট সাহিত্য সম্ভার বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আধুনিক জীবন চর্যায় এইসব গ্রন্থের সদর্থক, ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে এঁরা নীরব থাকেন। যদি কোনও প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি এর বিপরীত কিছু করেন তাহলে সেই প্রচেষ্টা বা সিদ্ধান্তকে হেয় ও বানচাল করার জন্য কলম ধরেন, সোচ্চার বিরোধিতা করেন। কানাইলাল মণ্ডল এই পুস্তকটি রচনা ও প্রকাশ করে যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

বইটির প্রথম প্রকাশ (৪ ফাল্গুন, ১৪২৩) বাবদে বেশ কিছু মুদ্রণ সহ অন্যান্য প্রমাদ চোখে পড়েছে। আশা করা যায় আগামী সংস্করণে এই ত্রুটি থাকবে না। ১ম প্রচ্ছদে দেওয়া অনন্তশয্যায় শায়িত শ্রী বিষ্ণুর চিত্রটিও প্রমাদ দুষ্ট। পুস্তিকার মুদ্রণ, কাগজ, বাঁধাই ইত্যাদির মান যথেষ্ট ভাল। লেখকের একটি কবিতার বইও প্রকাশিত হয়েছে। 'আত্মবিলাপ'। আশা করা যায় গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণের কাছে বইদুটি সমাদর পাবে।

পুরাণ কথা : লেখক— কানাইলাল মণ্ডল। মূল্য ৫০ টাকা মাত্র। মুদ্রক : অনু প্রেস, কীর্ণাহার, বীরভূম। ফোন : ৯৭৩২১৫৯০৪১

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

লবণের অপকারিতা

সত্যানন্দ গুহ

আধুনিক সভ্যতায় লবণ একটা বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। লবণ ছাড়া রান্নাবান্নাই অচল। মুখে কিছু উঠবে না। আজকাল শাঁখালু, শশা, আনারস, আমড়া, বাতাবিলেবু খেতেও আমরা নুন মিশিয়ে খাই। প্রকৃতিই ফলের মধ্যে লবণ দিয়ে রেখেছে। শরীরে লবণ বেশি হলেই কিডনি দুর্বল হয়ে যায়। কিডনি বাড়তি লবণ বের করে দিতে চায়। ব্যর্থ হলেই গ্রন্থিবাত, চর্মরোগ, সর্দি ইত্যাদি আক্রমণ করে। মহাত্মা হ্যানিমেন উল্লেখ করেছেন, লবণ খাওয়ার অভ্যাসের জন্যই মানুষের শরীরে রোগের রাজত্ব শুরু হয়েছে।

যথেষ্ট শাকসবজি ফলমূল খেলেই আমাদের শরীরের প্রয়োজনীয় লবণ পাওয়া যায়। একজন মানুষের গড়ে দৈনিক ২ গ্রাম লবণই যথেষ্ট। উত্তরমেরুর এস্কিমো, মধ্য-আফ্রিকার বহু জাতি লবণ ও মসলা খায় না। বন্য জীবনজন্তুরা লবণ খায় না বলে তারা সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন পায়। লবণ ও মসলার খাবার খেয়েই বাঙালিদের ৯০ শতাংশ নানা রোগে ভোগেন।

সাধারণ লবণ বেশি খেলেই টিসু বিপর্যস্ত হয়। জৈব লবণ তত ক্ষতি করে না; শরীর আত্তীকরণ করতে পারে। কাঁচা নুন সর্বদাই পরিত্যাজ্য। নোন্‌তা খাবার, নোন্‌তা বিস্কুট, নোন্‌তা ভাজাভুজি খুবই ক্ষতিকর। সাধারণত লবণের চেয়ে সৈন্ধব, করকচলবণ মন্দের ভাল। লবণ খাদ্য হজম করালেও তার বিষক্রিয়া অন্য ভাবে হয়। লবণজলে হাত ডুবিয়ে রাখলে ঘা হয়ে যায়, আর পাকস্থলীর কোমল ত্বকে জমা হলে গ্যাসট্রিক আলসার, পেটে নানা ধরনের ক্ষত সৃষ্টি হয়। আজ ঘরে ঘরে কোষ্ঠবদ্ধতা, হৃদরোগ, পোলিও পাথুরি, হাঁপানি, চর্মরোগ, শরীরে জ্বালাযন্ত্রণা ও স্নায়বিক দুর্বলতা লবণেরই অবদান। ক্যান্সার রোগের বড় শত্রু নুন। কিশোর যুবকরা অনেকটা সামলে নিতে পারে, কিন্তু চল্লিশ পেরোলেই নুন সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে।

জাপানিরা লবণ বেশি খায় বলে উচ্চ রক্ত চাপে ভোগে। আমাদের দেশেও ফল-মূল, বাদাম, লেবুর সঙ্গে নুন খেয়ে বহু লোক হাইপ্রেসারে ভুগছেন। ডাঃ নীল লাভেরসন উল্লেখ করেছেন মেয়েদের ঋতুরোগ, খিটখিটে মেজাজ, বিষাদ ভাব, অতিরিক্ত যৌন প্রবণতার ৮০ শতাংশ কারণই অতিরিক্ত লবণের ব্যবহার। মেয়েরা ভাতের পাতে, সিদ্ধদ্রব্যে, পোড়াখাদ্যে, স্যালাডে নুন বেশি ব্যবহার করেন। কাঁচা লবণ, ভাজা লবণ, রান্না করা লবণ সবই বিষ। কেউ কেউ খেলোয়াড়দের, পরিশ্রমী লোকদের, পেট রোগীদের লবণজল, লবণ দেওয়া সরবত বা পানীয় খেতে বলেন। খাদ্য বিজ্ঞানীদের মতে তা খুবই ক্ষতিকর। পরিশ্রমের ফলে ঘাম হওয়া ভাল এই জন্য যে শরীরের অতিরিক্ত লবণ ঘামের মাধ্যমে বের করে শরীরকে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

দৌড়বীররা লবণযুক্ত খাবার কম খান। ফুসফুস ও হৃদ্‌যন্ত্রের ক্ষতি হবে, দম ফুরিয়ে যাবে বলে লবণ দেওয়া খাবার এড়িয়ে চলেন। সাধারণ লবণ সব প্রাণীর পক্ষেই প্রাণঘাতী। কোনো পোকামাকড় লবণের কাছে যায় না। তারা টক, মিষ্টি খাবরের ওপর বসে। মাছি বা পিঁপড়ে পর্যন্ত লবণের ওপর বসে না। শিঙি, মাগুর, কৈ মাছ, জোঁক ও পোকামাকড়ের ওপর লবণ ছিটিয়ে দিলে আধমরা হয়ে যায়। লবণ জীবনশক্তি নষ্ট করে দেয়।

আমরা কতভাবে যে লবণ খাই তার হিসাব রাখি না। বিস্কুট, পাউরুটি তৈরি করতে লবণ মেশানো হয়, মুড়ি ভাজতে লবণ মেশানো হয়। মাখন দিয়ে রুটি খেতে, ঘি ভাত খেতে, দৈ, লস্যি পান করতে লবণ খাওয়া হয়। মুড়ি দুধ একত্রে খাওয়া ক্ষতিকর। মুড়ির নুন দুধের মধ্যস্থ নুনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। দেহ বিষিয়ে ওঠা, দাঁত কালচে হওয়া, টাক পড়া, পুরুষত্বের হানি হওয়া বেশি নুন খাওয়ারই ফল। মহাত্মা হ্যানিমেন লিখেছেন—সোরাই (লবণ) সর্ববিধ পীড়ার কারণ। তরুণ পীড়া মাত্রই সুপ্ত সোরার সাময়িক উচ্ছ্বাসমাত্র। প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার নীলমণি ঘটক তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, কুচিন্তা, কুকর্ম। প্রতিহিংসা পরায়ণ হওয়া, সত্য হতে বিচ্যুত হওয়া লবণ খাওয়াই কুফল, সোরাবৃক্ষ থেকেই যত রোগ। গোবরডাঙ্গা প্রাকৃতিক মিশনের চিকিৎসক অধ্যাপক নীরেন্দ্রলাল গুহর মতে... সবজাতের লবণই আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর। প্রাকৃতিক খাদ্যের মাধ্যমেই লবণ আমাদের শরীরে গৃহীত হয়। বনের পশু, পাখিরা, উপজাতি মানুষরা বাহ্যিক লবণ ব্যবহার করে না বলে তারা সুস্থ ও সবল। সভ্য মানুষই বেশি রোগের কবলে পড়ে। প্রাকৃতিক চিকিৎসার লক্ষ্য রোগী, পীড়িত দেহ বা শরীরের যত্ন নহে। যাবতীয় পীড়া খাদ্য থেকে, পানীয় থেকে এবং মনের বিকৃতি থেকে ঘটে থাকে। চাপা দেওয়া রোগই নতুন রোগের জন্ম দেয়।

নুনের অপকারিতা সম্পর্কে আরও প্রচার চাই। নুনের পাত্রে লিখে রাখা উচিত—'বিষ'। তবে মানুষ সতর্ক হবে।

(লেখক একজন প্রাকৃতিক চিকিৎসক)

বিস্তীর্ণ সবুজের কোলে চিরনিদ্রিত এক স্কটিশ সাহেব

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ব্রিটিশ সার্ভেয়রদের একটি দল ১৮২০ সালে তামিলনাড়ুর আন্নামালাই পর্বতশ্রেণী পরিদর্শনে গিয়ে যথেষ্ট খুশি হয়েছিলেন। তাদের খুশির কারণ আন্নামালাই পার্বত্য অঞ্চলে গাছগাছালির আধিক্য। টিক ও রোজউড জাতীয় গাছই বেশি। সে সময় কলকারখানা স্থাপনে কাঠের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে কারণে ব্রিটেনের মাইলের পর মাইল ওকগাছের জঙ্গল নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কলকারখানা তৈরি করার পাশাপাশি ব্রিটিশ শাসকদের আরও একটা বাধ্যবাধকতা ছিল। কলোনিগুলিতে নৌশক্তি বৃদ্ধি করা। তার জন্য প্রচুর জাহাজ চাই। অর্থাৎ বিপুল পরিমাণ কাঠ প্রয়োজন। ভারতে তখন রেললাইন পাতার কাজ সদ্য শুরু হয়েছে। এ কাজেও কাঠ লাগবে। সুতরাং ঘন সবুজে ঢাকা আন্নামালাই পর্বতশ্রেণী দেখে যে ব্রিটিশ সার্ভেয়ররা উল্লসিত হবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

অতঃপর শুরু হলো নির্বিচারে গাছ কাটা। প্রতি মাইল রেললাইনে ২০০০টি কাঠের গুঁড়ি লাগে। এছাড়া ইঞ্জিনের জ্বালানি হিসেবেও কাঠ প্রয়োজন। পাহাড়ে সবুজ তার ঘনত্ব হারাতে শুরু করল। কাঠ কেটে কিছুটা পাঠিয়ে দেওয়া হতো তিরুচিরাপল্লীতে। সেখানে স্থাপন করা হয়েছে রেলের জন্য বিশেষ টিম্বার তৈরির কারখানা। বাকিটা যেত তখনকার বম্বেতে। সেখানে বম্বে শিপইয়ার্ডে তৈরি হতো যুদ্ধজাহাজ। কিন্তু মুশকিল হলো, বিশালাকৃতি টিক গাছ কেটে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া ছিল দুঃসাধ্য। পাহাড় থেকে নদী পর্যন্ত বিপজ্জনক রাস্তায় কাঠ বয়ে আনা হতো হাতির সাহায্যে। তারপর জলে ভেসে কাঠ পৌঁছতো ওপারের সমতলে। দিয়েত্রিচ ব্র্যান্ডিজ লিখিত ফরেস্টাইজেশন ইন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি নামক গ্রন্থে (১৮৮৩ সালে প্রকাশিত) উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর শুধু রেললাইন পাতার জন্যেই ৪০ হাজার গাছ কাটা হতো। ১৮৮৫ সাল নাগাদ আন্নামালাই তার সবুজ হারিয়ে ধূসর হয়ে যায়। পরের তিন দশকেও অবস্থার বিশেষ তারতম্য ঘটেনি।

আন্নামালাইয়ের দুঃখ ঘুচল ১৯১৫ সালে। সেবার কোয়েম্বাটোরের দক্ষিণ বিভাগে ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট অফিসার হয়ে এলেন স্কটল্যান্ডের হুগো উড। পুরো নাম হুগো ফ্রানসিস অ্যানড্রিউ উড। তিনি ডিস্ট্রিক্ট অফিসার পদে বহাল ছিলেন ১৯২৫ পর্যন্ত। তিনি আন্নামালাইয়ের সবুজ ধ্বংস বন্ধ করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে বন্ধ করতেও পেরেছিলেন।

প্রথমেই তিনি স্থানীয় ইংরেজ কর্তাদের সঙ্গে নির্বিচারে পশুহত্যা এবং গাছ কাটার সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে কথা বললেন। আশেপাশে জনজাতিদের সঙ্গে তার একটা সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তারা যেসব অধিকার যুগযুগান্ত ধরে ভোগ করে আসছে হুগো উড তাদের সম্মান করতেন। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ সরকার আন্নামালাই সংলগ্ন অরণ্যভূমিকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করায়, জনজাতি সমাজের অনেকেই বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন। হুগো উড তাদের স্বভূমিতে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

পরিকল্পনার পরের ধাপটি ছিল তুলনায় কঠিন এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্যায়ে এসে হুগো উড নির্বিচারে গাছ কাটার জন্য ইংরেজ শাসককে তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন এবং চালু করেছিলেন এক নতুন অরণ্যনীতি। তিনি জানতেন শীতকালে ডালপালা ছেঁটে দিলে বসন্তকালে গাছের বৃদ্ধি দ্বিগুণ হয়ে যায়। কিন্তু সব গাছের বৃদ্ধি তো আর দ্বিগুণ করা যাবে না। তাই শুরু হলো চিহ্নিতকরণের কাজ। একদম দাগ কেটে ঠিক করে দিলেন কোন কোন গাছের গায়ে পঁচিশ বছর পর্যন্ত হাত দেওয়া যাবে না। গাছপালার প্রতি তাঁর প্রেম জীবদ্দশাতেই প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। এই প্রেম কতটা নিখাদ তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি ঘটনায়। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। জাহাজ তৈরি করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের প্রচুর কাঠ প্রয়োজন। কিন্তু নির্দেশ আসা মাত্র তিনি পত্রপাঠ জানিয়ে দিয়েছিলেন, আন্নামালাইয়ের একটি গাছও তিনি কাটতে দিবেন না।

১৯২৫ সালে হুগো উড অবসর নিলেন। তখন তিনি মারাত্মক যক্ষ্মায় আক্রান্ত। স্বাস্থ্যের কারণেই তিনি কুনুরে চলে যান। তামিলনাড়ুর বনদপ্তর থেকে প্রকাশিত পুস্তিকার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী হুগো উড অবিবাহিত ছিলেন। স্কটল্যান্ডের মানুষ হলেও তার জীবন কেটেছে আন্নামালাইয়ের অসহায় গাছগাছালির পরিচর্যায়। তিনি মারা যান ১৯৩৩ সালের ১২ ডিসেম্বর। তখন তার বয়েস ৬৩ বছর।

মৃত্যুর কয়েক মাস আগে হুগো উড উইল করেছিলেন। সেখানেই তিনি জানিয়েছিলেন তাঁর শেষ ইচ্ছের কথা। ইচ্ছাটি অদ্ভুত। সারাজীবন তিনি টিক গাছের অসংখ্য বীজ বপন করেছেন। তাদের ছায়ায় হাওয়ার গান শুনতে শুনতে তিনি চিরকালের মতো ঘুমিয়ে পড়তে চান। তাঁর ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছে। আন্নামালাই গেলেই যে কেউ দেখতে পাবেন টিক এবং রোজউডের ছায়ায় হুগো উডের সমাধি ও স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ কয়েকটি ল্যাটিন শব্দ : 'সাই মনুমেন্টাম রিকোয়ারস সারকামস্পাইস'। এর অর্থ, যদি আপনি সমাধিস্থ মানুষটির স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে চান তাহলে এই অরণ্যকে দেখুন। ■

ভারতীয় টেনিসের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল : আখতার আলি

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনি ভারতীয় টেনিসের দ্রোণাচার্য। দেশকে বহু তারকা তৈরি করে দিয়েছেন, তারা ডেভিসকাপে ভারতকে বহু স্মরণীয় জয় এনে দিয়েছেন। মধ্য আশিতেও তিনি দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে বেড়ান যদি কোনও প্রতিভার ঝলক দেখতে পান। এখন হয়তো সক্রিয় ভাবে কোচিং করাতে পারেন না কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ টিপস বা ইনপুট দিয়ে সেই প্রতিভাকে সঠিক দিশা দেখাতে পারেন। আর তার সুযোগ্য পুত্র জিশান আলি এখন ভারতের সহকারী কোচ। এহেন আখতার আলি ভারতীয় টেনিস নিয়ে অকপটে মেনে ধরলেন তার স্বপ্ন, আশা- আকাঙ্ক্ষার কথা।

□ সেকাল একাল টেনিসের কী পার্থক্য দেখছেন?

● বিরাট বিবর্তন হয়ে গেছে বিশ্ব টেনিসে। আমার সময়ে অর্থাৎ ৫০-৬০ এর দশকে কাঠের র‍্যাকেটে খেলা হতো। সার্ভিস থেকে শুরু করে ফোরহ্যান্ড, ব্যাকহ্যান্ড সব ধরনের শটে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তখনকার যারা গ্রেটমাস্টার যেমন ড্রবনি, বাজ, টিলডেন লেভার, রোজওয়াল এরা প্রত্যেকেই অনুপম শিল্পী ছিলেন। র‍্যাকেট যেন কবিতা তৈরি করত দেশ-বিদেশে জুড়ে সব কোর্টে। এত অর্থও পেতেন না তাঁরা কিন্তু সম্মান, মর্যাদায় ছিলেন সর্বোচ্চস্তরে। এখন টেনিসে প্রচণ্ড শক্তি, গতি এসে গেছে। আগে সুপারম্যান হতে হবে তারপর টেনিস খেলোয়াড়। একটা টুর্নামেন্ট জিতলেই কয়েক কোটি ডলার। বিশ্বের অন্যতম ধনী ক্রীড়াবিদ এখন টেনিস তারকারা। খেলা থেকে শিল্প-সৌন্দর্য হারিয়ে গেছে, যন্ত্রদানবের মতো অঙ্ক কষে গতি ও শক্তি নির্ভর টেনিস খেলে যাচ্ছে বর্তমান যুগের খেলোয়াড়রা। তার মধ্যেও চোখের আরাম ও মনের খোরাক জুগিয়ে যাচ্ছে, ফেডেরার ডেভিড গফিন গেইল মরফিসের মতো গুটিকয় ক্লাসিকাল টেনিস আর্টিস্ট।

□ ভারতীয় টেনিসের ভবিষ্যৎ কীরকম দেখছেন?

● রামনাথন রামকুমার, ইভকি ড্রামাব্রিদের হাত ধরে ভারত আবার ডেভিসকাপের ওয়ার্ল্ড গ্রুপে ঢুকে পড়বে এই বিশ্বাস আমার আছে। আর নিখাদ ভারতীয় জুটি দ্বিবীজ শরণ ও পূরব রাজা বেশ কিছু বছর এটিপি সার্কিটে ভাল ফল করবে আর ডেভিসকাপে ডাবলসে যে সুমহান ঐতিহ্য আছে আমাদের দেশের— সেই ঐতিহ্য ও গৌরবের পতাকা বহন করে নিয়ে চলবে। এরা সবাই যথেষ্ট প্রতিভাবান। শুধু এদের দরকার বিশ্বমানের ট্রেনিং ও নিয়মিত বিদেশে বড়মানের টুর্নামেন্ট এক্সপোজার। এখন চ্যালেঞ্জার টুর্নামেন্ট খেলছে, ভাল পারফর্মও করছে। এরপর র‍্যাঙ্কিং আরও উন্নত করে মূল এটিপি টুর সার্কিটে ঢুকে বড় জয় পেলেই আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে। সেই আত্মবিশ্বাস ডেভিসকাপে কাজে আসবে।

□ লিয়েন্ডার পেজের কি অবসর নেওয়া উচিত?

● লিয়েন্ডার বিশ্ব টেনিসে ডাবলসে সর্বজনীন কিংবদন্তীর পর্যায়ে চলে গেছেন। দেশকে ডেভিসকাপে বহু স্মরণীয় জয় উপহার দিয়েছেন। ডেভিসকাপে যুগ্মভাবে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ডাবলসের প্রেক্ষিতে। ননপ্লেয়িং ক্যাপটেন মহেশ ভূপতি আর পেজের জুটি একসময়ে বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে এক নম্বরে ছিল। দুজনের সম্পর্ক হয়তো আগের মতো নেই কিন্তু মহেশের উচিত লিয়েন্ডারকে আর একটা সুযোগ দেওয়া ডেভিসকাপ ডাবলস খেলার যাতে ইতালির মিকোল পিয়েত্রাঞ্জলির ওপরে চলে যেতে পারে রেকর্ড গড়ে আর তারপরই লিয়েন্ডারের অবসর নিয়ে নেওয়া উচিত। অনেক বয়স হয়েছে, প্রচুর কীর্তি স্থাপন করেছেন। অপমান, অসম্মান মাথায় নিয়ে তাঁর মতো জিনিয়াসের কোর্ট ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত নয়।

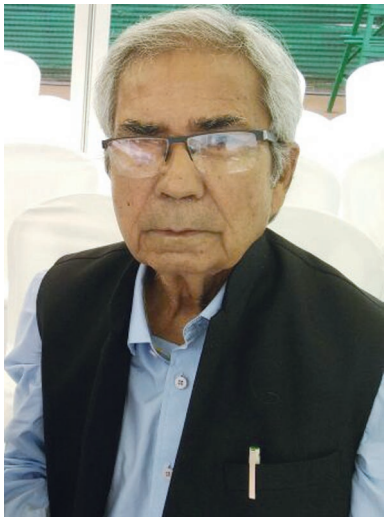

আখতার আলি

□ বাংলার সব অ্যাকাদেমির পরিচালন পদ্ধতি কি ঠিক?

● আমি বাংলায় জন্মেছি, বড় হয়েছি। তাই বলতে পারি জয়দীপ মুখার্জির অ্যাকাদেমি ও বেঙ্গল টেনিস অ্যাকাদেমি যেভাবে চলছে তা মোটামুটি একটা স্তর পর্যন্ত ঠিক আছে। বাচ্চাদের গ্রুমিং করার ক্ষেত্রে এখানকার স্থানীয় কোচেরা বেশ দক্ষ। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে একটু বড় হয়ে যখন তারা রাজ্য ও জাতীয় স্তরে টুর্নামেন্ট খেলবে তখন যে ধরনের প্রশিক্ষণ দরকার সেটা পাচ্ছে না। আমি আমেরিকার কিংবদন্তী কে. বলতেয়ারির ফ্লোরিডার অ্যাকাদেমিতে গিয়ে দীর্ঘকাল কাটিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি সেরকম অভিজ্ঞতা কজনের আছে। বলতেয়ারির কিংবা হ্যারি হাম্যানের মেলর্বোন অ্যাকাদেমিতে গিয়ে শিখে আসা উচিত কীভাবে দেশ-বিদেশের উঠতি প্রতিভাদের তৈরি করা হয়। অবশ্য তারজন্য স্পনসর দরকার। এখানে স্পনসররা বড় বড় টুর্নামেন্টে টাকা ঢালে ব্যবসায়িক প্রচার ও স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। উচিত ভালো কোচ ও ট্রেনারদের বিদেশে পাঠিয়ে আধুনিক উন্নত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি শিখে এসে তা যাতে এখানে সুষ্ঠভাবে প্রয়োগ করতে পারে সেটা দেখা। একসময়ে ভারত বিশ্বের প্রথম ৫/৬ টি দেশের মধ্যে ছিল। তিনবার ডেভিসকাপ রানার্স হয়েছে। ঠিকমতো পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করলে আবার ভারতীয়রা দুনিয়ার সব প্রান্তে উজ্জ্বল দিকচিহ্ন মেলে ধরতে পারে। ■

জয়দেব কেঁদুলি

মকর সংক্রান্তিতে বীরভূমের অজয় নদের তীরে বসে কেঁদুলির মেলা। কবি জয়দেবের স্মরণে বাউলরা মিলিত হয় এখানে। আর সাধারণ মানুষ যায় মকরের পুণ্যস্নান করতে। গীতগোবিন্দ'র রচয়িতা কবি জয়দেব অজয়ের তীরে বসে তাঁর কাব্যসাধনা করেছেন। সে আজ থেকে প্রায় আটশো বছর আগের কথা। প্রচলিত আছে রাধামাধব নাকি স্বয়ং এসে কবির রচনার একটি পংক্তি লিখে দিয়েছিলেন— 'দেহি পদপল্লবমুদারম্'।

কেঁদুলি থেকে প্রায় আঠারো ক্রোশ দূরে কাটোয়া। অজয় নদ সেখানে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে। কবি জয়দেব প্রতিদিন সেখানে গিয়ে স্নান করতেন। ফিরে এসে পূজা করতেন রাধামাধবের। ভক্তের এই নিষ্ঠা দেখে ভগবানের কৃপা হলো। তিনি জয়দেবকে একদিন স্বপ্নে বললেন, 'তোমাকে আর এতদূর কষ্ট করে আসতে হবে না, বছরে একবার মকর সংক্রান্তির দিন কাকভোরে আমিই যাবো উজান অজয়ে। ওই একদিনের স্নানেই তোমার সারাবছরের গঙ্গাস্নানের পুণ্য মিলবে।' তখন থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিবছর মকর সংক্রান্তির দিনে ভোর থেকে শুরু হয় পুণ্যস্নান। দূরদূরান্তের গ্রাম থেকে দলে দলে কত মানুষ আসে পুণ্য অর্জন করতে। অজয়ের তীরে বসে বাউলদের আখড়া। সারারাত ধরে চলে বাউল কীর্তন। বৈষ্ণবের আখড়া থেকে ভেসে আসে ধর্মকথার নানা সুর। গায়ে গেরুয়া বসন হাতে একতারা বাজিয়ে বাউল গেয়ে ওঠে—

দেখবি যদি চল রে মন জয়দেবে যাই
যেথা গুপ্ত বৃন্দাবন,
সেথা ভক্তিরসের বইছে জোয়ার
তাতে ভাসেন কত মহাজন।
রাত পোহালে রোজ সকালে ডুব দাও মন
গঙ্গা বলে অজয় সলিলে,
খ্যাপা মুছে যাবে মনের কালি
করবি যুগল দরশন।

গাড়ি ভাড়া করে, পায়ে হেঁটে কত মানুষ যে আসে সেই গান শুনতে তার ইয়ত্তা নেই। সন্ধ্যে থেকে সারারাত ধরে শোনে বাউল কীর্তন। তারপর সকালে আবার যে যার বাড়ি ফিরে যায়।

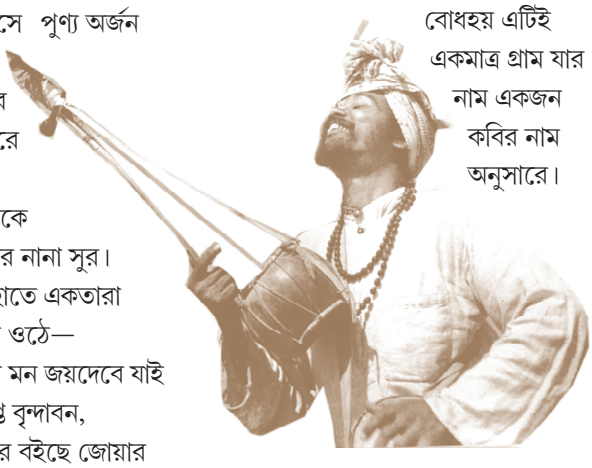

কবি জয়দেবকে মনে রেখে সেই গ্রাম এখন জয়দেব নামে পরিচিত। ভারতের বোধহয় এটিই একমাত্র গ্রাম যার নাম একজন কবির নাম অনুসারে।

বর্ষাকালে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে অজয় আর শীতের এই সময় শীর্ণ হয়ে বয়ে চলে। নদের তীরে রাঙা বালুরাশির উপর বসে মেলা। কনকনে ঠাণ্ডায় মকর সংক্রান্তির রাত থেকে আখড়ায় আখড়ায় জ্বলতে থাকে ধুনি। বাউল ফকির ও ভক্তরা মেতে ওঠে বাউল গানে।

মেলা মানে মানুষের সমাগম, মানুষের মিলন। কিন্তু জয়দেব কেঁদুলি তার চেয়েও কিছু বেশি। সেখানে মানুষের মুক্তি মেলে। বাউল ও বৈষ্ণব সাধকদের অধ্যাত্ম দর্শনে মানুষ তার মনের শান্তি খুঁজে পায়। বিনোদন নয়, সাধনার ক্ষেত্র। তাই জয়দেব এখন কেবল আর একটি গ্রামীণ মেলা নেই। বিদেশ থেকেও কত মানুষ সেখানে আসে। মেলায় নাগরিক পরিষেবা খুব ভালো নেই, তবু মানুষ যে কীসের টানে সেখানে যায় তা না দেখলে উপলব্ধি করা যায় না। অজয়ের উন্মুক্ত বালুচর, হাড় কাঁপানো শীত, তারই মাঝে একটি ভক্তি সাগর। বছরের পর বছর ধরে ভক্তিস্রোতের এই পরম্পরা বহন করে চলেছে বীরভূমের জয়দেব কেঁদুলি।

বিরাজনারায়ণ রায়

ভারতের পথে পথে

আঁটপুর

হুগলী জেলার আঁটপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান স্বামী প্রেমানন্দ অর্থাৎ বাবুরাম ঘোষের বাড়ি। এই বাড়িতেই ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর গভীর রাতে শ্রীরামকৃষ্ণের পদাশ্রিত ও কৃপাপ্রাপ্ত ৯ জন যুবক— নরেন্দ্র, বাবুরাম, শরৎ, শশী, তারক, কালী, নিরঞ্জন, গঙ্গাধর, সারদা প্রমুখ প্রজ্বলিত ধুনির লেলিহান শিখাকে সাক্ষী রেখে দেশ ও দশের কল্যাণের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প গ্রহণ করেন। সেই ঘটনার স্মরণে মন্দির তৈরি হয়েছে। এখনও ২৪ ডিসেম্বর গভীর রাতে পুতাগ্নি উৎসব হয়। আঁটপুরে তিনশো বছরের একটি প্রাচীন বকুল গাছ রয়েছে। এখানকার সারদা ভবনে প্রতিদিন অন্নভোগ পাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

জানো কি?

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ছদ্মনাম আন্নাকালী পাকড়াশী।
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম অনিলাদেবী।
- দাদাঠাকুরের আসল নাম শরৎচন্দ্র পণ্ডিত।
- সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম বনফুল।
- প্রমথনাথ বিশি নাম স্বাক্ষরে প্র না বি লিখতেন।
- ঠাকুর রামকৃষ্ণের ছেলেবেলার নাম গদাধর বা গদাই।

ভালো কথা

শ্রদ্ধানিধি

সেদিন মদনকাকুর মায়ের শ্রাদ্ধের নিয়মভঙ্গে গিয়ে খেয়েদেয়ে আমরা দাঁড়িয়ে গল্প করছিলাম। হঠাৎ কাজলকাকু মদনকাকুর মায়ের ফটোর সামনে সবাইকে ডেকে নিয়ে বললেন মদনদার মায়ের আত্মার শান্তি কামনায় বেশ কয়েকজন দুঃস্থ মানুষকে কম্বল দেওয়া হবে। মদনকাকু ও কাকিমা বেশ কয়েকজনকে দিলেন। যাদের কম্বল দেওয়া হলো তারা আমাদের সঙ্গেই বসে খেয়েছেন। কম্বল পেয়ে ওরা খুশিমনে চলে গেলেন। কাজলকাকু বললেন— এটাকে শ্রদ্ধানিধি বলা হয়। আয়োজন থেকে কিছু বাঁচিয়ে গরিব-দুঃখীদের দিতে হয়। আনন্দ অনুষ্ঠানে দিলে তাকে মঙ্গলনিধি বলা হয়। আমার খুব ভালো লাগলো। আগে কোনোদিন এরকম দেখিনি তো!

মধু রাজভর, নবম শ্রেণী, হালিসহর, উ: ২৪ পরগনা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ম স হো ব	(১) ভা দ ন্মা বো
(২) ক তি স্মৃ ফ	(২) প তী ব দ্মা

২৫ ডিসেম্বরের সংখ্যার উত্তর

(১) গায়েহলুদ (২) দোলপূর্ণিমা

২৫ ডিসেম্বরের সংখ্যার উত্তর

(১) সমান্তরাল (২) হাড়বজ্জাত

উত্তরদাতার নাম

(১) রূপষা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯। (২) রাজর্ষি মণ্ডল, তেহট্ট, নদীয়া। (৩) অরিত্র নন্দ, এগরা, পূ. মেদিনীপুর। (৪) মৌ সরকার, গাজোল, মালদা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

বনবাসী ক্ষেত্রে শিক্ষা, উন্নয়ন, জাগরণ, সংস্কার
এবং আধ্যাত্মিক চেতনা বিকাশের জন্য

পূজ্য শ্রীভূপেন্দ্রভাই পণ্ড্যাজী দ্বারা

গীতা জ্ঞানযজ্ঞ

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মযোগের ওপর ব্যাখ্যা

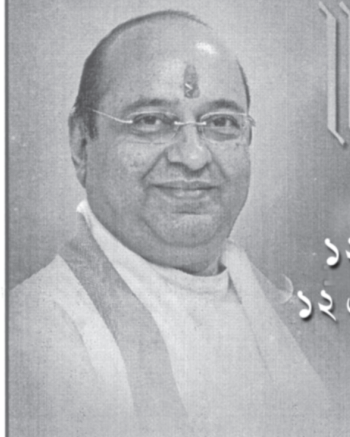

১২ জানুয়ারি শুক্রবার থেকে ১৪ জানুয়ারি রবিবার, ২০১৮
১২ এবং ১৩ জানুয়ারি বিকেল ৩.৩০ মি. থেকে সন্ধ্যা ৬.৩০ মি.
১৪ জানুয়ারি দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত

স্থান : কলামন্দির, কলকাতা

সবার সাদর আমন্ত্রণ

वनबंधु परिषद
FRIENDS OF TRIBALS SOCIETY

For just ₹ 20,000/-you can adopt a school for one year for its integrated development

हमारी योजनाओं के अन्तर्गत

हमारे प्रकल्प	वर्तमान (सितम्बर २०१७)	लक्ष्य २०१८-१९
प्रशिक्षित कथाकार	3550	4000
श्रीहरि रथ (वीडियो रथ)	27	50
संस्कार केन्द्र	51461	60000
एकल विद्यालय	58672	65000

श्रीहरि सत्संग समिति
SHREEHARI SATSANGA SAMITY

For just ₹ 4,000/- you can adopt one sanskar kendra for one year for its integrated development

समिति को दिया गया अनुदान आयकर की धारा 80G के अन्तर्गत कर मुक्त है। कृपया अपनी अनुदान राशि SHREEHARI SATSANGA SAMITY के नाम से प्रदान करें।

আয়োজক
শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতি, কলকাতা
একল ভবন, ১২৩/এ, হরিশ মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০০২৬, দূরভাষ : ৯১ ৩৩ ২৪৫৪ ৪৫১০ / ১১/১২/১৩, ৪০০৪৮১২৭

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
8 January - 2018 - Rs. 10.00,

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০্ টাকা।।